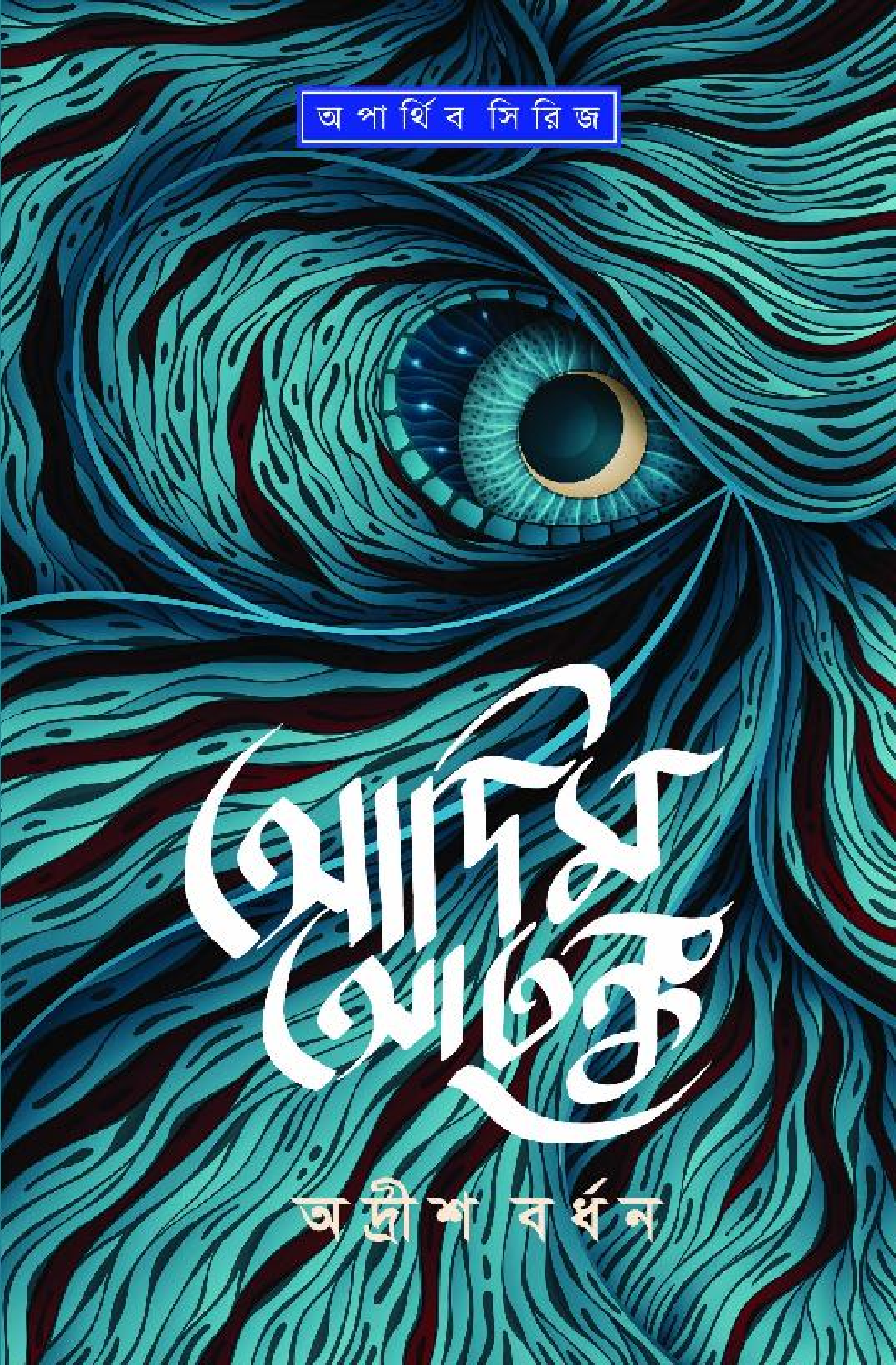

অপার্থিব সিরিজ
আদিম আতঙ্ক
অদ্রীশ বর্ধন

আদিম আতঙ্ক

আদিম আতঙ্ক

কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার

অদ্রীশ বর্ধন

ফ্যানট্যাস্টিক ও কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস
যৌথ প্রয়াস

Adrish Bardhan

প্রথম প্রকাশ	জানুয়ারি ২০০১
প্রথম যৌথ প্রকাশ	নভেম্বর ২০১৯
প্রচ্ছদ	কল্পবিশ্ব
ক্যালিগ্রাফি	সৌরভ দে
অলংকরণ	জয়া ঠাকুর
হরফ সজ্জা ও পৃষ্ঠাবিন্যাস	সন্তু বাগ
বর্ণশুদ্ধি	সুদীপ দেব ও সন্তু বাগ
পরিবেশক	অরণ্যমন প্রকাশনী ৩/সি যদুনাথ দে লেন, কলকাতা ১২ আলাপন: +৯১-৭২৭৮৯৯২৫৪০
ISBN	৯৭৮-৮১-৯৪৩৫২৩-০-৩
প্রকাশক	ফ্যানট্যাস্টিক এবং কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস যৌথ প্রয়াস **ফ্যানট্যাস্টিক** ৪ রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা ৭০০০১৪ **কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস** ৩৭২/৩ দমদম রোড, সুরের মাঠ, কলকাতা ৭০০০৭৪ ইমেল: kalpabiswa.publications@gmail.com ওয়েবসাইট: kalpabiswabooks.com আলাপন: +৯১-৯০৫১৩৭০১১৬
মূল্য	২০০ টাকা

উৎসর্গ

ফ্যান্টাসটিকের দিনে পাশে থাকা
সুরজিৎ দে-কে

প্রকাশকের কথা

বাংলায় 'কল্পবিজ্ঞান'-এর জয়যাত্রা কিন্তু অনেকদিনের। ১৯৬৩ সালে অদ্রীশ বর্ধনের আশ্চর্যের হাত ধরে শুরু যে স্বর্ণযুগের, কালের নিয়মে তা আজ হারিয়েছে বিস্মৃতির অন্তরালে। উপযুক্ত প্রকাশক ও গবেষণার অভাবে তা দ্রুত মুছে যাচ্ছে ইতিহাসের পাতা থেকে। কল্পবিশ্ব প্রকাশনীর উদ্দেশ্য শুধু নতুন লেখক প্রতিভাকে সামনে আনাই নয়, কল্পবিজ্ঞানের ঐতিহ্যকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা।

'আদিম আতঙ্ক' একটি শ্বাসরোধী কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার। এটি আমেরিকান লেখক ডিন কুন্‌জ এর লেখা 'ফ্যান্টমস' উপন্যাস থেকে অনুপ্রাণিত। উপন্যাসটি প্রথমে ধারাবাহিক আকারে প্রকাশিত হয়েছিল শুকতারার পাতায় ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০০০ সালের জানুয়ারি মাস অবধি। ২০০১ সালে উপন্যাসটি প্রথম বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল 'আরুণি পাবলিকেশনস' থেকে। বাংলা কল্পবিজ্ঞানের আগ্রহী পাঠকদের জন্যে প্রায় ঊনিশ বছর পরে কল্পবিশ্ব ফ্যান্টাসটিক প্রকাশনের সঙ্গে যৌথভাবে উপন্যাসটি পুনঃপ্রকাশের দায়িত্ব নিল। বইটি প্রকাশের দায়িত্ব ও অনুমতি দেবার জন্যে অদ্রীশ বর্ধন ও তাঁর পুত্র অম্বর বর্ধনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

আশা করি, কল্পবিশ্ব ও ফ্যান্টাসটিক এর যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত 'অপার্থিব সিরিজ' এর অন্তর্গত এই কল্পবিজ্ঞান থ্রিলারটি কল্পবিজ্ঞানের ইতিহাসের পাতায় যোগ্য সমাদর পাবে।

প্রকাশক
নভেম্বর ২০১৯

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

অম্বর বর্ধন, কেয়া বর্ধন, জয়া ঠাকুর, সঞ্জীব মিত্র
সুমিত বর্ধন, সুদীপ দেব, সৌরভ দে, সুপ্রিয় দাস



চিৎকারটা ভেসে এল অনেক দূর থেকে।

ভয়ের চিৎকার। নিঃসীম আতঙ্ক ঠিকরে এল গলা চিরে। কিন্তু ওই একবারই। আর না। একবার চেঁচিয়েই বুঝি দম ফুরিয়ে গেল মেয়েটার। অথবা থেমে গেল কলজে।

ম্যাগাজিনের পাতা থেকে চোখ সরে এসেছিল সুমন্তর। সুমন্ত সেন। হাজত দারোগা। ছোট মাপের অফিসার। বয়েসেও ছোট। মাত্র আটাশ বছর। মনটা তাই এখনও গল্পের জগতে ভেসে যেতে ভালোবাসে।

পড়ছিল একটা গা-ছমছমে গল্প। উদ্ভট। অবৈজ্ঞানিক। হোক। গায়ের লোম তো খাড়া হচ্ছিল।

ঠিক ওই সময়ে সৃষ্টিছাড়া ওই চিৎকার। নৈঃশব্দ্য খানখান করা। খুব অল্পক্ষণের জন্য।

ঘাড় কাত করে চোখ কুঁচকে রইল সুমন্ত। কিন্তু আর সে চেঁচাচ্ছে না। কণ্ঠে বুঝি কুলুপ পড়ে গেল নিমেষে।

চেয়ারে নড়ে উঠল সুমন্ত। সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আর্তনাদ করে উঠল চেয়ার। ভাঙা চেয়ারের চিৎকার।

খোলা জানলা দিয়ে বিকেলের রোদ এসে পড়েছে কাঠের টেবিলে। পালিশ-চটা খুবলে খুবলে যাওয়া সস্তা কাঠের টেবিল। থানার টেবিল এর চাইতে ভালো হয় না।

জানলা দিয়ে রাস্তার খানিকটা দেখা যাচ্ছে। এ তল্লাটের সব চাইতে চওড়া রাস্তা এটা। মূল সড়কও বটে। নাম, শিবালয় অ্যাভিনিউ।

রাস্তা এখন ফাঁকা। দু'পাশের গাছগুলোর পাতা নড়ছে হাওয়ায়। গোটা শহরে নিবিড় শান্তি ছড়িয়ে রয়েছে।

বেখাপ্পা ওই চিৎকারটা। ছন্দপতন ঘটিয়েছিল মুহূর্তের জন্যে।

এই সময়টা এইভাবেই ঝিমিয়ে থাকে টাউন। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর ফাঁকা যায়। পর্যটনবিলাসীরা তখন এদিকে আসে না। হাজত আর থানার কাজও কম। বসে বসে হাতে-পায়ে মর্চে ধরে যায়।

কাজ শুরু হবে অক্টোবর থেকে। দলে দলে পর্যটকরা আসবে পাহাড়ঘেরা নিরালা এই তল্লাটে।

অলস চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে সুমন্ত। নির্জন পথে গাড়ি নেই, মানুষ নেই, কুকুর পর্যন্ত নেই। একটামাত্র হোটেল খুলে রেখেছে বটে—অফ-সিজন বলে সেখানে তেমন লোকও নেই। দুটো মোটেলও খুলে রেখেছে—গাড়ি নেই সেখানেও।

পুরো টাউন এখন পাণ্ডব-বর্জিত। তা সত্ত্বেও কে অমন চেঁচাল?

জানলা থেকে চোখ সরিয়ে আনে সুমন্ত। চোখ ঘুরছে পত্রিকার পাতায়। এমন সময়ে আবার শোনা গেল একটা চিৎকার।

এবার বিষম আতঙ্ক বুঝি মূর্ত হয়ে উঠল কলজে-ছেঁড়া সেই চেঁচানির মধ্যে। আগের চিৎকারের চাইতেও লোমহর্ষক। আরও বিকট।

কিন্তু এ-চিৎকার তো নারী-কণ্ঠ ফুঁড়ে ঠিকরে এল না। এ যে পুরুষ-কণ্ঠ!

বহুদূর থেকে উত্থিত হয়েই নিমেষে স্তব্ধ হয়ে গেল বটে ঠিক আগের মতনই—কিন্তু ভয়ালতা অনুরণন জাগিয়ে চলল সুমন্তর কর্ণেন্দ্রিয় দিয়ে মস্তিষ্কের অণু পরমাণুতে...

পত্রিকা মুড়ে রাখল সুমন্ত। উৎকর্ণ হয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ—আবার যদি শোনা যায় বিশ্রী বিকট চিৎকার দুটোর যে কোনও একটা। কিন্তু টুঁটি-টেপা নৈঃশব্দ্য ফের চেপে বসেছে গোটা টাউনে।

একে তো হিমালয়ের কোল বলে এখানকার সবকিছুই বড় শব্দহীন। তার পর অফ-সিজন। অথচ দু'দুটো মানুষ একটু আগেই গলাবাজি করে গেল। দুজনেই ভয় পেয়েছে। তাই অমন অমানুষিক চেঁচিয়েছে। দুজনেই অকস্মাৎ নীরব হয়ে গেছে।

সুমন্ত সেন আর বসে থাকতে পারল না। পত্রিকা উলটে রাখল টেবিলে, চাপা দিল পেপারওয়েট দিয়ে। ফিরে এসে পড়বে। এখন একটু টহল দিয়ে আসা যাক।

উঠল চেয়ার ছেড়ে। আবার সেই কর্কশ চিৎকার। চেয়ারের চিৎকার।

রিভলভারটা সঙ্গে নেওয়া দরকার। যারা অমন বিকট চেঁচিয়েই গলায় কুলুপ লাগায়—নিশ্চয় তারা বিপদে পড়েছে। সব বিপদেরই মোকাবিলা করা যায় গুলিভরা রিভলভার হাতে থাকলে...

হোলস্টারশুদ্ধ বেল্ট আলমারি থেকে টেনে নামিয়ে কোমরে বেঁধে নিল সুমন্ত। এই বেল্টেই ঝোলে ছোট ছুরি। দু'মুখ ধারালো। এক হাতে ছুরি আর এক হাতে রিভলভার নিয়ে সুমন্ত একাই দশ-বিশ জনকে সামাল দিতে পারে।

চামড়ার বুট এবার তার নিজস্ব আওয়াজ তোলে মেঝের ওপর। সুমন্ত আকারে নাতিদীর্ঘ হতে পারে—কিন্তু ওর চলার মধ্যে ঠিকরে বেরোয় ব্যক্তিত্ব। বুটের এই খট খট আওয়াজ শুনলেই হৃৎকম্প হতে থাকে ক্রাইম-লিপ্ত মহাপুরুষদের। সেই সঙ্গে ওর রুদ্র চোখের চাহনি আর কাঠচেরা কণ্ঠের হুঙ্কার...

সব মিলিয়ে, অপরাধীদের কাছে সুমন্ত সেন একটা ত্রাস... একটা জীবন্ত বিভীষিকা। একাই পাকড়ায় দুষ্কৃতীদের—টেনে এনে ঢোকায় লক-আপে...

পাশাপাশি তিনটে খাঁচা। তিনটেই খালি। ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে খাঁচা তিনটের দিকে রুদ্রচক্ষু বুলিয়ে নেয় সুমন্ত। একটু পরেই নিশ্চয় খাঁচাদের খিদে মেটাতে পারবে। ওদের শূন্য উদর পূর্ণ করে দেবে।

খাঁচাঘরের পরেই বড় দরজা। এই দরজার পরে ভিজিটরদের ঘর। এ-ঘরে বড় বড় বেঞ্চি পাতা।

খট খট খট খট শব্দের পাদুকা-বাদ্য বাজিয়ে এই দরজার দিকে অগ্রসর হয় সুমন্ত। চৌকাঠ এখনও পাঁচ ফুট দূরে। খাঁচাগুলো বুঝি তৃষিত নয়নে পাশ থেকে দেখছে ওকে। এমন সময়ে অস্ফুট একটা শব্দ শোনা গেল পেছনে।

নিমেষমধ্যে টানটান হয়ে গেল সুমন্ত সেনের সর্বাঙ্গ। কেননা, আওয়াজটা এল পেছনের যে-ঘর থেকে, সে-ঘরে তো এই মুহূর্তে কেউ নেই! একা বসেছিল সুমন্ত। সে ঘরে জানলা একটাই—গরাদ দেওয়া। দরজাও একটা—তাতে তালা ঝুলছে। ও ঘরে ঢুকতে হলে যেতে হয় এই খাঁচাঘরের মধ্যে দিয়ে।

কিন্তু কেউ ওর পাশ দিয়ে যায়নি—ঢোকেনি অফিসঘরে। কেউ ছিলও না সে ঘরে। অথচ, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে না আসতেই এ কীসের আওয়াজ?

ক্ষীণ হলেও কান এড়ায়নি সুমন্তর। জুতোর খটখটানিতেও চাপা পড়েনি। হাওয়ায় ম্যাগাজিনের পাতা উলটে যাওয়ার আওয়াজও নয়—ম্যাগাজিন তো ও উলটে রেখে এসেছে—ওপরে চাপা দেওয়া আছে ভারী পেপারওয়েট...

এতগুলো চিন্তা একযোগে খেলে গেল সুমন্তর সজাগ ব্রেনের মধ্যে দিয়ে। কোমরে রিভলভার ঝোলালেই পালটে যায় ওর চেহারা—ব্যক্তিত্ব শত-মুখ ছুরির মতন ফলা উঁচিয়ে ধরে।

তাই সজাগ হয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে নিথর দেহে দাঁড়িয়ে রইল সুমন্ত। পেছনের আওয়াজের দিকে ফিরে তাকানোর আগে সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করল হাতে-পায়ে-চোখে। ঘুরে দাঁড়াল পরক্ষণেই...

বিস্ফারিত হল দুই চক্ষু! আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল দুই চোখের রুদ্র কটাক্ষে... শূন্য কক্ষ আর শূন্য নয়, এবং...!



এখন সেপ্টেম্বর সবে শুরু হয়েছে। বাতাসে সামান্য টান ধরেছে। অপরাহ্ন মিলিয়ে যাবার ফিকিরে আছে—জায়গা ছেড়ে দেবে সন্ধ্যাকে।

বিকেল আর সন্ধ্যা। ভাই আর বোন। এরা যখন হাত ধরাধরি করে, তখনই তো গোধূলি লগ্ন। বড় মিষ্টি এবং বড় রহস্যময়। পৃথিবীর প্রথম মুহূর্ত থেকে গোধূলির বড়ই সমাদর অন্ধকার দুনিয়ায়। রাতের চারটে প্রহরেই অশুভ অশরীরীরা নিজেদের বের করে আনে খাঁচার ভেতর থেকে। চলে তাদের অট্টরোল আর হট্টমেলা। প্রত্যূষের প্রভায় তারা গুটি গুটি কেটে পড়ে নিজেদের কন্দরে।

অশুভ বাসনাদের ফুর্তি শুধু তামসিক অন্ধকারেই—রজনীর তিমির অবগুণ্ঠনেই। তাদের উল্লোলনৃত্য—প্রভাতে সব নিরুদ্দেশ।

প্রকাণ্ড পৃথিবীর অজস্র অন্ধকার কারাগারে তখন তারা বন্দী। তাদের হদিশ আজও কেউ পায়নি। পৃথিবী আজও পরম রহস্যময় এদেরই জন্যে।

এরা ছিল, আছে, থাকবে।

শিবালয় টাউনেও নেমেছে গোধূলি। চারদিকের পাহাড়ে পাহাড়ে তার চোখজুড়োনো সুষমা ছড়িয়ে পড়ছে।

এ বড় সুন্দর জায়গা। ভূস্বর্গ বললেই হয়। যেদিকে দু'চোখ যায়, সেদিকেই শুধু পাহাড়। ঘন সবুজ ক্রমশ আরও ঘন হয়েছে পেছনের পাহাড়গুলোয়—একটু একটু করে কালচে হয়েছে, ধূসর হয়েছে, তারপর ধোঁয়াটে হয়ে দিগন্তে বিলীন হয়েছে।

সবুজ রঙের মধ্যে থেকে আরও একটা রং ঠেলে উঠছে। নীল রং। বড় বড় পাইন, ফার—যত রকমের চিরহরিৎ বৃক্ষ আছে—প্রত্যেকেরই গা মুড়ে দেওয়া হয়েছে যেন একই রকমের পুরু ফেল্ট কাপড় দিয়ে—যে-ফেল্ট পেতে দেওয়া হয় বিলিয়ার্ড টেবিলে। ঘন, মোলায়েম, স্নিগ্ধ। ছায়াগুলোও তাই যেন বড় ঠান্ডা। গোধূলি যতই সন্ধ্যার হাতে নিজেকে ছেড়ে দিচ্ছে—নরম শীতল ছায়াগুলো ততই লম্বা হচ্ছে—নিজেদের আকার আয়তন বাড়িয়ে চলেছে। মিনিটে মিনিটে গাঢ়তর হচ্ছে। এখুনি তো শুরু হবে তাদেরই রাজত্ব। ছায়া সাম্রাজ্য। তমিস্র-অধীশ্বরের আবির্ভাবের পথ চেয়ে তাই তারা ছায়ার কার্পেট পেতে দিচ্ছে গাছ আর পাহাড়ের পাশে পাশে।

মুগ্ধ চোখে মাধবী লাহা দেখে যাচ্ছে অবর্ণনীয় এই রূপরাশি। স্টিয়ারিং হুইলে দু'হাত রেখে তন্ময় হয়ে দেখছে প্রকৃতিকে। প্রকৃতি এমনই একটা সত্তা, যে নিতান্ত অ-কবিকেও কবি বানিয়ে দেয়। হিপনোটিক এফেক্ট ছড়িয়ে পড়ে কাঠখোট্টা ব্যক্তিরও অণু-পরমাণুতে।

গাড়ি ছুটছে... ছুটছে মাধবীর মনও। ছুটছে সেইখানে—যেখানে রয়েছে ওর গৃহ। সুইট হোম।

মাধবী বাড়ি ফিরছে। দীর্ঘ সময় পর।

শিবালয় শহরের হর্তাকর্তা বিধাতারা শহরের সৌন্দর্য বাড়িয়ে রেখেছেন শহরে প্রবেশের বহু আগে থেকেই। এখানকার রাস্তা তাই বেশ চওড়া। পাশাপাশি তিনটে গাড়ি নক্ষত্রবেগে যাতে ধেয়ে যেতে পারে—তার ব্যবস্থা।

মাধবী স্টিয়ারিং হুইলে একটু মোচড় দিয়ে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল এহেন একটি রাস্তায়। কিছুদূর গিয়েই রাস্তা একটু সরু হয়েছে—কেননা এ রাস্তা এখন গিরিপথ হয়ে গেছে। দু'পাশে উদ্দাম উত্তুঙ্গ পাহাড়। মাঝখানে পাথর উড়িয়ে তৈরি হয়েছে এই পথ। দুটো গাড়ি এখন পাশাপাশি যেতে পারে।

এইভাবেই পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে এল মাধবী। শিবালয় শহর আর বেশি দূরে নেই। পেছনের সিটের মেয়েটি এতক্ষণে একটি কথা বলল, 'কী সুন্দর!'

দুই বোন, গাড়ি চালাচ্ছে মাধবী। পেছনে বসে পরি।

পনেরো বছর ছাড়াছাড়ি ছিল, দুই বোনে। মাধবী ডাক্তারি পাশ করে চাকরি করেছে। মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু চিঠির মধ্যে দিয়ে। বাবা আগে মারা গেল—একদিন পরেই মা। তাই পরিকে নিয়ে এসেছে মাধবী। শিবালয় টাউনে অনেক আগে একটা নিবাস রচনা করেছিল—বোনকে নিয়ে যাচ্ছে সেখানে। পরির বয়স তেরো, মাধবীর আটাশ।

গাড়ি ঢুকে পড়েছে শহরে। চলেছে শিবালয় অ্যাভিনিউর ওপর দিয়ে। দু'পাশের কটেজগুলো নানা ঢঙের—কিন্তু কংক্রিটের জঙ্গল হতে দেয়নি শহরকে। পাথর, স্লেট,

ইট, কাঠ, টালি—এই, দিয়েই পাহাড়ি কুঁড়ের গড়নে তৈরি প্রতিটি আস্তানা।

এ-শহরের নিয়ম তাই। নিয়নের চোখ ধাঁধানো দ্যুতি পর্যন্ত বরবাদ। মামুলি কাঠের সাইনবোর্ড। ঠিক যেন একটা সাজানো পাহাড়ি গ্রাম। স্নিগ্ধতায় হাত পড়েনি আজ।

অথচ, মাধবীর মনে হল, এই মুহূর্তে শিবালয় শহর যেন মড়ার শহর হয়ে রয়েছে...

গা শিরশির করা এই নিস্তব্ধতা নাড়া দিয়েছিল পরিকেও। বলেছিল, 'কথাও বলতে জানে না।'

'কে রে?'

'এই শহর।'

'বড্ড চুপচাপ বলে?'

'এত চুপচাপ ভাল্লাগে না।'

মাধবী নিজেও অবাক হয়েছে। বছরের এই সময়ে শিবালয় শহর ঠান্ডা মেরে থাকে ঠিকই—কিন্তু মড়ার মতন নিথর হয়ে থাকে না। কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। আশ্চর্য!

খটকা লেগেছিল বলেই স্পীড কমিয়ে এনেছিল মাধবী। এমনিতেই স্পীড কমাতে হত। কেননা, রাস্তা পাহাড়ের গা বেয়ে সটান ওপর দিকে উঠে গেছে। রাস্তার শেষ যেখানে শহরেরও শেষ সেখানে। তারপরেই স্কি-লিফট। তুষার জমে যখন বরফ হয়ে যায়, তার ওপর দিয়ে তীরবেগে ধেয়ে যাওয়ার আর লাফিয়ে ছিটকে যাওয়ার মারাত্মক মঞ্চ।

স্কি-লিফট এই শহরের মূল আকর্ষণ। রয়েছে শহরের একদম মাথায়। সেখান থেকে পাহাড় আরও উঁচুতে উঠে গেছে। ওইটাই পশ্চিম দিক। পুব দিকটা নিচে। যেদিক থেকে ঠেলে উঠছে মাধবীর গাড়ি।

সাজানো শহর। ধনকুবেরদের চাঁদার টাকায় পরিচ্ছন্ন শহর। পুব থেকে পশ্চিমে খাড়াই উঠে গেছে এই যে রাস্তা শিবালয় অ্যাভিনিউ—এর দু'পাশে চতুষ্কোণ ব্লক। মাঝে মাঝে চৌমাথা। ডাইনে-বায়ে রাস্তা চলে গেছে। শহরের সর্বত্র যাওয়া যায় সহজেই। রাস্তা হারানোর ভয় নেই।

অথচ খাঁ খাঁ করছে দু'পাশ। বিচিত্র ব্যাপার।

শীতের আগের এই মিষ্টি বিকেলটায় কেউ বাড়ি বসে থাকতে চায় না। বারো মাস যারা এখানে থাকে, তারা এই নিরিবিলি অপরাহ্নকে হারাতে চায় না। বাড়ি থেকে

বেরিয়ে আশে সব্বাই—বসে থাকে পথের পাশে বাঁধানো বেদীতে, বেঞ্চিতে, ব্যালকনিতে।

বারো মাসের মানুষ এখানে অবশ্য খুবই কম। বাড়ি খালি করে বেরিয়ে এলেও রাস্তায় লোক গিজগিজ করে না কোনও সময়ে। অথচ মনে হয়, বড় জীবন্ত শহর এই শিবালয় টাউন।

দার্জিলিং-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এর জন্ম। দার্জিলিং-এর রাজনীতি এ শহরকে ছুঁতে পারেনি। পারবেও না।

পথের দু'পাশে দোকানগুলো তো খোলা রয়েছে। আলোও জ্বলছে। অথচ কেউ নেই দোকানে। বাড়িগুলোও প্রোজ্জ্বল—অথচ বারান্দায় কেউ নেই। গোল-গোল পাথর বাঁধানো বাহারি রাস্তায় কুকুর পর্যন্ত টহল দিচ্ছে না। শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিলকুল ফাঁকা। অদ্ভুত!

একটা চৌমাথা এসে গেছে। এখান থেকে ডাইনে আর বাঁয়ে দুটো রাস্তা চলে গেছে। ঠিক এইখানেই আস্তে ব্রেক কষল মাধবী। তাকাল বাঁয়ে—পরপর তিনটে ব্লক এখান থেকেই দেখা যায়। কেউ নেই রাস্তায়। তাকাল ডাইনে। এদিকে রয়েছে চারটে ব্লক। দেখা যাচ্ছে গাড়ির জানলা থেকেই। এদিকেও পথ জনহীন।

স্টার্ট দেয় মাধবী। পরের চৌমাথায় দাঁড়ায়। তাকায় ডাইনে-বাঁয়ে। কেউ নেই। পরের চৌমাথাতেও একই অভিজ্ঞতা।

পরি এতক্ষণ চুপ করে ছিল দিদির কাণ্ড দেখছিল। চৌমাথায় চৌমাথায় থেমে থেমে এগোচ্ছে দিদি, আর একটু একটু করে বাড়ছে ভুরু কুঁচকোনো। শেষকালে বলেই ফেলল, 'অত থামছ কেন?'

'আলো-টালো জ্বলছে, অথচ কেউ কোথাও নেই।'

'ঘরে বসে রয়েছে।'

'এ-সময়ে ঘরে কেউ থাকে না।'

'নিশ্চয় দারুণ প্রোগ্রাম আছে টিভি-তে।'

'তা হবে।'

'তুষার খানাঘর'ও এসে গেল পরের চৌমাথায়। এখানেও ব্রেক কষল মাধবী।

পরি বলল, 'বেড়ে নাম তো।'

'এ-শহরের সব কিছুই বাংলা। খাঁটি বাংলা। ইংরিজির নো অ্যাডমিশন।'

'অথচ ফরেন টুরিস্ট আসে?'

'তাদের জন্য ছোট বোর্ড আছে নিচের দিকে—দেখেছিস? বাংলা নামটা ইংরিজিতে লিখে তার ইংরিজি মানে দেওয়া হয়েছে।'

পরি যখন ছোট সাইনবোর্ড দেখছে, মাধবী তখন খানাঘরের ভেতরে চোখ চালিয়েছে।

আলো জ্বলছে এখানেও। কোণের জানলাগুলো ঝলমল করছে ভেতরের আলোয়। কাউকেই কিন্তু দেখা যাচ্ছে না।

অথচ ‘তুষার খানাঘর’ খুব পপুলার রেস্তোরাঁ। বাইরের মানুষের ভিড় শুরু হয় টুরিস্ট মরশুমে—কিন্তু বারো মাস এখানে আড্ডা মারতে আসে শহরের মানুষরা। খাবারদাবার সস্তা বলেই শুধু নয়—লোকজনের ব্যবহারও বড় ভালো। খাবার দিয়ে যায় মেয়েরা—হাসিমুখে। দোকানের মালিক নিজেও টেবিলে টেবিলে ঘুরে সবার খোঁজ খবর নেয়। সব মিলিয়ে, মনে হয়, বাড়ির বৈঠকখানায় এসে পড়লাম। কিন্তু এই মুহূর্তে কেউ নেই। না মালিক, না খদ্দের।

মেয়েগুলোও নিপাত্তা।

পরি বলেছিল—টিভি-র দারুণ প্রোগ্রাম আছে নিশ্চয়। সায় দিয়েছিল মাধবী। কিন্তু মন থেকে দেয়নি। প্রোগ্রাম যতই টেরিফিক হোক, রাস্তা আর দোকানপাট খাঁ-খাঁ করবে কেন?

গাড়ি উঠছে একটু একটু করে। ভুরু কুঁচকে দু’পাশে বাড়িগুলোর জানলা আর বারান্দা দেখতে দেখতে চলেছে মাধবী—কাউকেই উঁকি দিতে দেখছে না—দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখছে না। রাস্তার একটামাত্র চলমান গাড়ি দেখে কেউ ছুটে বেরিয়েও আসছে না। কুকুরদের ঘেউ ঘেউ ডাকও শোনা যাচ্ছে না।

এই যে ঢালু রাস্তা পুব থেকে পশ্চিমে উঠে গেছে—এইটাই এই শহরের শিরদাঁড়া! এরই শেষের দিকে বাড়ি কিনেছে মাধবী। মূল রাস্তা থেকে একটু বাঁদিকে—স্কি-লিফট এর কাছেই। টুরিস্ট সিজনে বাড়ি থেকেই দেখা যায় স্কি-পাগলদের। আট ফুট লম্বা আর চার ইঞ্চি চওড়া কাঠের জুতো পায়ে বেঁধে কী পাগলামিই না করে বরফের ওপর।

মাধবীর গাড়ি এসে গেল বাড়ির সামনে।

দোতলা বাড়ি। পাথর আর কাঠ দিয়ে তৈরি। চমৎকার ডিজাইন। দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। একতলায় তিনটে বড় জানলা—রাস্তার ওপরেই। ছাদ ঢালু—নীল আর কালো টালি দিয়ে ছাওয়া। সামনের দিকে বিশ ফুট চওড়া বাগান। বুক চিরে চলে গেছে গোল পাথর বাঁধাই রাস্তা। কোমর সমান উঁচু সবুজ ঝোপের বর্ডার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে এই বাগান আর বাড়িটাকে।

ঝোপের মাঝামাঝি জায়গা থেকে শুরু হয়েছে বাগানের রাস্তা। রাস্তার শেষে বাড়ির উঠোন। সেখানকার নেমপ্লেট রাস্তা থেকেই দেখা যায়: ডা. মাধবী লাহা। নামের পাশে খানকয়েক ডিগ্রী।

মাধবীর গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। কিন্তু দরজা খুলে কেউ বেরিয়ে এল না। যদিও মাধবী খবর পাঠিয়েছিল আগেই।

বাসন্তী কি ঘুমোচ্ছে? এই অবেলায়?



তুষার

গাড়ি রাখার ছোট্ট জায়গায় গাড়ি ভিড়িয়ে দিল মাধবী। পরি বললে, 'ফুটফুটে বাড়ি তো!'

মন্দ বলেনি পরি। শুধু ফুটফুটে নয়, টুকটুকেও বলা যায় ছোট্ট এই বাড়িটাকে। নিজের বাড়ি বলতে তো এতদিন কিছুই ছিল না মাধবীর। এই তার প্রথম নিজস্ব বাড়ি। এ বাড়ির দিকে তাকালেই মনটা শান্ত হয়ে যায়।

এখনও তাই হচ্ছে। এতক্ষণ ভুগছিল চাপা টেনশনে। এখন রিল্যাক্সড। আশপাশের অদ্ভুত পরিবেশ মুহূর্তের জন্যে মুছে গেল মন থেকে।

বললে, 'একতলার অর্ধেক আমার। অফিস আর ওয়েটিং রুম। বাকি অর্ধেক ব্যাঙ্কের দখলে। তাহলেও সুন্দর বাড়ি। দেখলে মনে হয়, শুধু চেহারায় নয়—চরিত্রেও এ-বাড়ি আর পাঁচটা বাড়ির থেকে আলাদা। তাই নয় কি?'

'ঠিকই তো।'

এতক্ষণ কথা হচ্ছিল গাড়ির মধ্যে বসে। এবার নেমে আসে বাগানের রাস্তায়। পড়ন্ত রোদ হিমেল হাওয়াকে যেন আয়-আয় করে ডেকে আনছে। কনকনে শৈত্য বেশ টের পাওয়া যাচ্ছে। মাধবীর গায়ে ফুলহাতা সবুজ সোয়েটার। পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত জিনস ট্রাউজার্স। তা সত্ত্বেও হাড়সুদ্ধ যেন কেঁপে উঠছে। এ-সময়ে অবশ্য এখানকার আবহাওয়ায় এই খেলাই দেখা যায়। দিনে মোলায়েম ভাব—রাতে হাড়কাঁপানো ঠান্ডা।

একটানা অনেকক্ষণ ড্রাইভিং হয়েছে। আড়ষ্ট হয়ে গেছে মাসল। আড়মোড়া ভাঙে মাধবী। মাসল খিঁচে-ধরা তাতে যদি কমে। তারপর ঠেলে বন্ধ করে দেয় গাড়ির দরজা। খটাং আওয়াজটার প্রতিধ্বনি ফিরে আসে ওপরের পাহাড় থেকে, গড়িয়ে নেমে যায় নিচের শহরে। গোধূলির নিথরতায় জাগায় সামান্য শিহরণ—একটিমাত্র শব্দের শিহরণ।

ডাক্তার মাধবী লাহার কানের মধ্যে দিয়েই সেই শব্দ বিচিত্র এক বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে মগজের মধ্যে। গোটা মগজটা থমথম করে ওঠে সেই আশ্চর্য ইলেকট্রিক সিগন্যালে। একটিমাত্র শব্দ। মস্ত এক সঙ্কেত।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মাধবী। মনে পড়ে যায়, ফ্রেড হয়েলের লেখা বিখ্যাত সেই কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংলাপটা। এ সংলাপ মানুষের নয়—এক ইনটেলিজেন্ট কালো মেঘপুঞ্জের। আক্রমণ হেনেছিল সৌরজগতে। ধ্বংস করে এনেছিল পৃথিবীকে। কিন্তু ভালো লেগেছিল বিঠোফেনের বি-ফ্ল্যাট-মেজর সোনাটা।

বলেছিল, 'শব্দকে আমরা ব্যবহার করি শুধু মনের মতন বৈদ্যুতিক ছন্দের প্যাটার্ন গড়ে নিয়ে ব্রেনকে আরও বেশি কাজে লাগানোর জন্যে।'

শব্দ! ইলেকট্রিক্যাল প্যাটার্ন! সিগন্যাল!

শৈত্যবোধটা আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে মাধবীর সারা গায়ে। আস্তে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ায় গাড়ির পেছনে। তাকায় শিবালয় শহরের দিকে। শহরের মাঝের দিকে। কোথাও কিছু নড়ছে না।

পরিও তাকিয়েছিল নিচের শহরের দিকে। মুখে ভাসছে খুশি। কথাতেও ঠিকরে আসে উচ্ছ্বাস, 'দিদিরে, এইখানেই আমি থাকব চিরকাল।'

জবাব দিল না মাধবী। তার মন তখন ছুটছে প্রতিধ্বনির পেছনে। ফিরে তো এল না প্রতিধ্বনির ঢেউ। নামতে নামতে হারিয়েই গেল। বাতাসের নরম শব্দ ছাড়া এখন আর কোনও শব্দ নেই।

সাইলেন্স, সাইলেন্স... খণ্ড খণ্ড নৈঃশব্দ্য বিরাজমান চারিদিকে। কসমিক সাইলেন্সও বুঝি এত ভয়াবহ নয়। নৈঃশব্দ্য তো একরকম হয়—একই চেহারার আর চরিত্রের হয়—সাহিত্যিকরা এককথায় বলেন অখণ্ড নৈঃশব্দ্য।

কিন্তু মাধবীর তো তা মনে হচ্ছে না। যেন অগুন্তি নৈঃশব্দ্য খণ্ড খণ্ড চেহারা আর চরিত্র নিয়ে ভাসছে তার চারপাশে। রাতের শ্মশানে টের পাওয়া যায় এই নৈঃশব্দ্যকে—টের পাওয়া যায় গোরস্থানে—মৃতদেহকে ঘিরে গড়ে ওঠে যে কালান্তক নৈঃশব্দ্য—এ যেন তাই।

ধাঁধায় পড়ে মাধবী। হঠাৎ এ-ধরনের ভাবনা মনের মধ্যে চেপে বসছে কেন, তা বুঝে ওঠে না। নৈঃশব্দ্য তো তার কাছে নতুন কিছু নয়। শব্দের উৎপাত অসহ্য লাগে তার কাছে বরাবরই। কিন্তু কখনও তো এমনভাবে ভাবেনি যে নৈঃশব্দ্যরও অনেক চেহারা, অনেক চরিত্র থাকতে পারে। এই মুহূর্তে টুঁটি টিপে ধরা বিশেষ এই নৈঃশব্দ্যটাকেই বা শ্মশানে অথবা গোরস্থানের নৈঃশব্দ্য বলে মনে হচ্ছে কেন? এই পাহাড়ি অঞ্চলে গরমকালের রাতের নৈঃশব্দ্য সে উপভোগ করেছে মনপ্রাণ দিয়ে।

সে বড় মিঠে নৈঃশব্দ্য। যদিও তা নিরেট নৈঃশব্দ্য নয় মোটেই। ঝাঁকে ঝাঁকে পোকাদের উৎপাত চলে জানালার বন্ধ সার্সির ওপর। বাইরের বাগানে সমানে গান গেয়ে যায় ঝিঁঝিঁ পোকা। নিশাচর পাখি মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটায়। হাওয়ায় মাঝে মাঝে অদ্ভুত আলোড়ন। সব আওয়াজ মিলে মিশে গিয়ে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে যখন তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে—তখন তা নিছক নৈঃশব্দ্য না হলেও—শব্দের জগতে তার ঠাঁই নেই। এছাড়াও শহরের নিদ্রা যখন গাঢ় হয়, তখন জাগ্রত হয় আর একরকম নৈঃশব্দ্য। গোটা শহরটা ঘুমিয়ে থেকেও যেন জেগে থাকে। নিঃশব্দে বলতে থাকে—দেখ, দেখ, ঘুমন্ত নগরীকেও তুমি টের পাচ্ছ মনের কান দিয়ে।... এই নৈঃশব্দ্যকেও ভালোবেসেছে মাধবী। অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে উপলব্ধি করেছে, নিশীথ নগরীর নীরব সংলাপ।

কিন্তু এইমাত্র যে নৈঃশব্দ্য করাল দাঁতের কামড় মেরে বসে গেল তার অণু পরমাণুতে—এই রকম নৈঃশব্দ্য তো কখনও শোনেনি মাধবী। শীতের রাতের হাড় হিমকরা নৈঃশব্দ্যের চেয়েও এর কামড় অনেক বেশি ভেতরে প্রবেশ করেছে শুধু একটাই কারণে...

অতলান্তই শুধু নয়—এর অতলে রয়েছে আতঙ্ক—অজানা আতঙ্ক—মুখ বুজে ঘাপটি মেরে রয়েছে তারা নৈঃশব্দ্যের মধ্যে... সুযোগ পেলেই মাথা তুলবে—নৈঃশব্দ্যকে খান খান করে ছাড়বে...

আর ঠিক এই কারণেই নার্ভাস হয়ে যায় মাধবী। ভয়-ভয় ভাবটা প্রকটতর হয়ে ওঠে। অবাঙমানসগোচর ভয় সহস্র প্যাঁচ মেরে ঘিরে ধরে ওর তনুমনকে...

যেন এক দানবিক অট্টহাসির পৈশাচিক অট্টরোল ফেটে পড়ার আগে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে নৈঃশব্দ্য নিতলের অন্ধকূপে।

গলা ফাটিয়ে চেঁচাবে মাধবী? সে সাহসও হচ্ছে না। প্রতিবেশীরা যদি দলে দলে বেরিয়ে আসে? ওর নার্ভাসনেস দেখে অনুকম্পার চোখে তাকায়? সে যে ডাক্তার—ভয় পাওয়া তো তাকে সাজে না।

মুগ্ধ নয়নে পাহাড়ি গাঁয়ের দিকে চেয়ে থেকে বললে পরি, 'এমন সুন্দর জায়গা ছেড়ে আমি কিন্তু যাচ্ছি না কোথাও। শান্তি... শুধু শান্তি!'

শান্তি? তা রয়েছে বটে। উপদ্রবের ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। তবে কেন অনাহূতদের অস্তিত্ব টের পেয়ে এমন সিঁটিয়ে যাচ্ছে মাধবী? ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়? অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বোধ? পাঁচটা ইন্দ্রিয়র বাইরের বিরাট জগৎ ওঁত পেতে থাকে তো অহোরাত্র—জীবজন্তুরা টের পায়—মানুষ সবসময় টের পায় না—মাধবীর মনের মধ্যে সেই শক্তির অকস্মাৎ উদয় ঘটছে কেন?

বোগাস! ছায়া দেখে চমকে উঠছে মাধবী। অল ননসেন্স!

গাড়ির পেছনকার ট্রাঙ্ক খোলে মাধবী। তুলে আনে পরির একটা বড় সুটকেস। তারপর আর একটা। দ্বিতীয় সুটকেসটা ধরে নামিয়ে নেয় পরি। হাত বাড়ায় ট্রাঙ্কের মধ্যে বাইরের ব্যাগটার দিকে।

'বেশি বোঝা নিসনি। বারে বারে নিয়ে যাবি।'

বইয়ের ব্যাগ আর সুটকেস নিয়ে লন পেরিয়ে চলে আসে দু'জনে পাথর দিয়ে বাঁধানো পথে। পথের শেষে গাড়িবারান্দা। ছায়া জমছে সেখানেও। যেন ছায়ার ফুল ফুটছে। একে-একে পাপড়ি মেলে ধরছে।

সামনের দরজা খুলে ধরল মাধবী। পা ফেলল ভেতরে। হাঁক দিল, 'বাসন্তী?' জবাব নেই।

'বাসন্তী, আমরা এসে গেছি।'

আওয়াজ মিলিয়ে গেল বাড়ির মধ্যেই। ভেতরের নৈঃশব্দ্য টুক করে গিলে নিল চড়া গলার ডাককে।

হলঘরের শেষ প্রান্তে জ্বলছে একটা আলো। বাড়ির আর কোথাও কোনও আলো জ্বলছে না। আলোটা জ্বলছে রান্নাঘরে। দরজাটা দু'হাট করে খোলা।

হাতের সুটকেস মেঝেতে নামিয়ে রাখল মাধবী। সুইচ টিপে জ্বালল হলঘরের আলো। ডাকল, 'বাসন্তী?'

'বাসন্তী কে, দিদি?' হাতের বই-ব্যাগ আর সুটকেস মেঝেতে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললে পরি।

'বলতে পারিস আমার হাউস-কীপার। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সবই করে। ও তো জানে এখন আমরা আসব। সাড়া দিচ্ছে না কেন? হয়তো রাতের রান্না নিয়ে মশগুল।'

'কানে কালা বোধহয়?'

'আরে না।'

'এখানেই থাকে?'

'হ্যাঁ। গ্যারেজের ওপরে মেজানিন ফ্লোরে,' কথা বলতে বলতে গাড়ির চাবি আর মানিব্যাগ ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেয় মাধবী। আয়না লাগানো দেওয়ালে সাঁটানো ছোট বাহারি টেবিলের ড্রয়ার। পেতলের ফ্রেম দিয়ে বাঁধানো আয়না।

দেখেই ভালো লাগে পরির, 'খুব বড়লোক তো তুমি। এমন সুন্দর আয়না—চব্বিশ ঘণ্টা কাজের লোক—'

হাসে মাধবী, 'তোর মাথা! বাসন্তীর জন্যে খরচ তো করতেই হবে রুগি দেখব, না হাঁড়ি ঠেলব?'

'বাসন্তী বোধহয় ওর ঘরে রয়েছে—চলো যাই।'

'তাহলে রান্নাঘরের আলো জ্বলবে কেন? আগে চল রান্নাঘরে।'

হলঘর পেরতে থাকে মাধবী—পেছনে পরি।

এসে গেছে রান্নাঘর। বেশ বড়। সিলিং বেশ উঁচুতে। ঘরের মাঝখানে রান্নার জন্যে বড় টেবিল। চারটে ইলেকট্রিক বার্নার রয়েছে সেখানে, একটা গ্রিল, খানিকটা জায়গা কুটনো কাটা আর ময়দা মাখার জন্যে। মাথার ওপর থেকে ঝুলছে চকচকে স্টেনলেস স্টিলের ইউটিলিটি র‍্যাক। হাতা, চামচে, খুন্তি, বাটি, থালা—সবই লাগানো রয়েছে সেখানে—হাত বাড়ালেই যাতে পাওয়া যায়। টেবিল-কাউন্টারের ওপরটা সেরামিক টালি দিয়ে বাঁধানো। নিচের ক্যাবিনেটগুলো কালচে পালিশের কাঠ দিয়ে তৈরি। ঘরের শেষপ্রান্তে রয়েছে একজোড়া ওয়াটার বেসিন, একজোড়া গ্যাস উনুন, একটা মাইক্রোওয়েভ উনুন, আর একটা রেফ্রিজারেটর।

ঘরে ঢুকেই বাঁয়ে মোড় নিয়েছিল মাধবী, এগিয়ে গেছিল দেওয়ালের গায়ে লাগানো ছোট্ট লেখবার টেবিলটার দিকে। এই টেবিলে বসেই খাবারের মেনু বানায় বাসন্তী, বাজারের ফর্দ তৈরি করে, হিসেব লেখে। বাইরে কোথাও গেলে, এইখানেই চিরকুট লিখে রেখে যায়—যাতে মাধবী বাড়ি ফিরেই পড়ে নেয়। কিন্তু সেরকম চিরকুট নেই টেবিলে। ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছে মাধবী, এমন সময়ে কানে ভেসে এল পরির অস্ফুট চিৎকার। জোরে নিঃশ্বাস নিয়েই থেমে গেল হঠাৎ।

পরি মাঝের রান্নার টেবিল ঘুরে এগিয়ে গেছিল ভেতর দিকে—টেবিলের শেষের দিকে। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে রেফ্রিজারেটারের পাশে, চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে, চেয়ে আছে মেঝের দিকে। বিস্ফারিত
চাউনি নিবদ্ধ রয়েছে জোড়া বেসিনের মাঝে—তলার মেঝেতে।

দূর থেকে এইটুকু দেখেই আতঙ্ক ফেটে পড়ল মাধবীর অণু-পরামাণুতে। জোরে পা চালিয়ে এগিয়ে গেছিল মাঝের বড় টেবিল ঘুরে পরির দিকে।

মেঝেতে শুয়ে রয়েছে বাসন্তী। চিৎ হয়ে মারা গেছে। দু’চোখের পাতা পুরো খোলা, কিন্তু সে চোখে প্রাণ নেই। ফুলে ঢোল হয়ে রয়েছে ওপরের ঠোঁট আর নিচের ঠোঁট। চেপে বসেছে জিবের ওপর। ঠেলে বেরিয়ে রয়েছে জিব—তাতে গোলাপি ভাব নেই—বিবর্ণ।

চকিতে এই দৃশ্য দেখেই চোখ সরিয়ে নিয়েছিল মাধবী। তাকিয়েছিল ছোট বোনের দিকে।

মাধবীর পায়ের আওয়াজ পেয়ে পরির ঘোর কেটে গেছিল। ডেডবডির দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে চেয়েছিল দিদির দিকে।

মাধবী ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল টেবিলের অন্যদিকে—ডেডবডি যেখান থেকে দেখা যায় না। বসাল টেবিলের সামনের চেয়ারে।

আস্তে আস্তে সহজ হয়ে আসে পরির দুই ঠোঁট। এতক্ষণ ছিল শক্ত। বললে, ‘ওই কি বাসন্তী?’

‘হ্যাঁ।’

‘কীরকম চেয়ে রয়েছে বলো? ফোলা সমস্ত শরীর... কালসিটে সারা গায়ে মুখে... চাউনিটা কী ভীষণ... অত কালসিটে কেন, দিদি?’

‘বেশ কয়েকদিন মড়া পড়ে থাকলে অমন তো হবেই।’

‘পচা গন্ধ তো নেই!’

ভুরু কুঁচকে যায় মাধবীর। দিন কয়েক আগে মারা গেলে শরীর কালচে মেরে যেতে পারে, ফুলেও উঠতে পারে—পচা গন্ধ তো থাকা উচিত।

ফের বলে পরি, 'মুখের ভাব অমন বিকট কেন? চাউনি অমন কেন? দেখছে কাকে?'

কী বলবে মাধবী?

পরিই বলে গেল, 'চেঁচিয়ে উঠেছিল বাসন্তী—মরে গেছে চেঁচানি শেষ হওয়ার আগেই।'

না, এরকম মড়া মাধবী লাহা কক্ষনো দেখেনি। পাশে হাঁটু গেড়ে বসে একদৃষ্টে চেয়েছিল মাধবী। চেনা মানুষের ডেডবডি এত বিকৃত হলে মনের মধ্যে কষ্ট তো জাগবেই।

গোটা মুখখানা ফুলে গেছে। ফুলে উঠেছে শরীরটাও। বাসি মড়া ফুলে ওঠে ঠিকই, কিন্তু সেই ফোলা আর এই ফোলায় আকাশ-পাতাল তফাত। তার চেয়েও বড় কথা, বাসি মড়ার পাশে বসলে নাকে দুর্গন্ধ ভেসে আসবেই। বাসন্তীর মড়া থেকে কোনও বাজে গন্ধ বেরচ্ছে না।

আরও খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে মাধবী দেখল, কালচে আর ফেটে-ফেটে যাওয়া চামড়ার এহেন অবস্থা তো টিস্যু পচন থেকে হয়নি। পচন যদি শুরু হয়ে থাকে, তাহলে তার জের এখনও চলা উচিত। অথচ এত ঠাহর করেও সেরকম কোনও লক্ষণ মাধবীর চোখে ধরা পড়ছে না। ফোস্কা নেই, ফুসকুড়ি নেই, গলে যাওয়া নেই, ক্ষত নেই। রস পর্যন্ত গড়াচ্ছে না। শরীরে পচন ধরলে তার প্রথম প্রকাশ ঘটে চোখে—কেননা শরীরের অন্য টিস্যুদের চেয়ে অনেক নরম টিস্যু দিয়ে তৈরি হয় চোখ। কিন্তু বাসন্তীর চোখ তো চমৎকার রয়েছে। পচনের চিহ্নমাত্র নেই। চোখের মণিদুটোও পরিষ্কার। ঘোলাটে ভাব দেখাই যাচ্ছে না—মৃত্যুর পর যেরকম দেখা যায়।

এই চোখ যখন জীবন্ত ছিল, তখন সেখানে অষ্টপ্রহর খুশির জোনাকি নেচে নেচে বেড়াত। আর ভাসত মমতা। বয়সে বাষট্টি হতে পারে, মাথার সব চুল পেকে সাদা হয়ে যেতে পারে—তবুও মুখখানা ভারী মিষ্টি ছিল বাসন্তীর। ঠাকুমা-দিদিমাদের মতন মায়া-মমতায় ভরা স্নিগ্ধ শীতল। কখনও নরম, কখনও শক্ত গলায় শাসন করে গেছে মাধবীকে—যেন দুষ্টু নাতনি। কথার টানে নেপালি ছোঁয়া থাকত—কিন্তু বাঙালিয়ানা ছিল বেশির ভাগ। গান গাইত বড় মিষ্টি গলায়। রান্না করতে করতে করতে গান, বেসিন ধুতে ধুতে গান—গান ছাড়া বুড়ির জীবনে যেন আর কিছুই ছিল না। সেই গান এ বাড়িতে আর শোনা যাবে না।

মাধবী যতই চায় ততই মনে হয়, চামড়া যেন থেঁতলে গেছে। সারা গায়ে বুঝি কালসিটে ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও কালো, কোথাও নীল, কোথাও কালচে-হলদে—কোথাও একটা রঙের ওপর আর একটা চেপে বসেছে। চামড়াকে ভয়ানক ভাবে থেঁতলানো না হলে এরকম রং ফুটে ওঠে না। কিন্তু থেঁতলানি তো শরীরের এক-

আধটা জায়গায় থাকা উচিত—শরীরময় এরকম থেঁতলানি যে একেবারেই নতুন ঘটনা। চামড়ায় এক ইঞ্চি জায়গাও বাদ নেই। প্রতি বর্গ ইঞ্চি চামড়াকে থেঁতলে পিটিয়ে ঘা দিয়ে কালসিটে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

মুখের প্রতি সেন্টিমিটারেও সেই থেঁতলানির চিহ্ন। নোড়া দিয়ে যেন ধরে ধরে পেটানো মুখের সমস্ত চামড়া—এতটুকু ফাঁক রাখা হয়নি কোত্থাও। ভাঙচোর নেই কোনওখানে—গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট ঘটলে যেমন দেখা যায়—এই রকম কালসিটে মেরে যায় গোটা মুখ—কিন্তু হাড়গোড় তো আস্ত থাকে না—যা রয়েছে এই মুখে—নাক চিবুক ঠোঁট চোয়াল—সবই রয়েছে আস্ত।

মেপে মেপে পিটিয়ে গেলে এইরকম কালসিটে দেখা দিতে পারে। কিন্তু তা কি সম্ভব?

আর একভাবে এই কালসিটে দেখা দিতে পারে। গোটা শরীরটাও বিরং হয়ে যেতে পারে। চাপটা যদি আসে শরীরের ভেতর থেকে। চামড়ার ঠিক নিচেই যে টিস্যু রয়েছে, সেই টিস্যু ফুলে উঠলে চামড়ার রং এইভাবে পালটে যেতে পারে। কিন্তু আপাদমস্তক এইরকম নিখুঁত থেঁতলানি আর কালসিটের ভাবকে ফুটিয়ে তুলতে হলে ফোলানিটা হওয়া উচিত আচমকা—ভয়ানক বেগে—অবিশ্বাস্য জোরে যদি না হয়, চামড়ায় সেরকম চাপ তো পড়বে না—কালসিটে আর থেঁতলানি জাগানোর মতন চাপ সৃষ্টি হবে না।

কিন্তু তা কি সম্ভব? না, কক্ষনো না।

শরীর কখনও দুম করে ফুলে বেলুন হতে পারে না—চামড়ায় অ্যাকসিডেন্টের এফেক্ট ফেলতে পারে না। জীবন্ত টিস্যু কখনওই এত বেগে হু-উ-উ-স করে ফুলে ওঠে না। কিছু কিছু অ্যালার্জি-কেসে হঠাৎ ফুলুনি বিচিত্র নয়—সবচেয়ে প্রকট ঘটনাটা দেখা গেছে পেনিসিলিনে যাদের অ্যালার্জি আছে, তাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু এমন কোনও কারণের সন্ধান আজও পায়নি মাধবী যা মানুষের শরীরকে ধাঁ করে ফুলিয়ে তুলতে পারে, চক্ষের নিমেষে শরীরময় কুৎসিত কদাকার কালসিটের ছাপ মেরে যেতে পারে... প্রতি বর্গ সেন্টিমিটার চামড়াকে থেঁতলে দিতে পারে...

গোটা শরীরটার এইভাবে ফুলে ওঠাকে ময়না-তদন্ত স্ফীতি বলেও চালিয়ে দেওয়া যায় না। এরকম স্ফীতি অবশ্য কালেভদ্রে দেখা যায়—তখন তাকে ক্লাসিক কেস বলা যায়।

কিন্তু এ কেস সে কেস নয়; এ বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই মাধবীর মনে। থেঁতলানির জন্যেও যদি বা হয়, শরীর ফুলবে কেন? প্রথম খটকা তো সেইখানেই।

তাহলে কি বিষ প্রয়োগ? খুবই বিরল বিশুদ্ধ বিজাতীয় বিষ না হলে তো এমন কাণ্ড সম্ভব নয়। বিষবিজ্ঞানে আজও এমন বিষের কথা লেখা হয়েছে বলে মাধবীর

মনে হয় না। তার চাইতেও বড় কথা, আশ্চর্য এই বিষের সান্নিধ্যে এল কীকরে বাসন্তী? বিষ ওর শরীরে ঢুকল কীকরে? বাসন্তীর তো কোনও শত্রু নেই।

বিষ নয়, বিষ নয়—অন্য কিছু।

বেকুব বনে যাচ্ছে মাধবী। আজ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে যতটুকু জেনেছে সেই জ্ঞানের নিরিখে বাসন্তীর মৃত্যুর কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণই খুঁজে পাচ্ছে না। হঠাৎ মাথার মধ্যে একটা চমক। নতুন কোনও সংক্রামক রোগ নয় তো?

'দিদি!' পরির গলায় উৎকণ্ঠা।

সাড়া দিল না মাধবী। ওর চেতনা জুড়ে তখন সাইক্লোন উঠেছে।

ডেডবডিতে এখনও আঙুল ছোঁয়ায়নি মাধবী। এখন মনে হল, জামাকাপড় না ছুঁলেও বুঝি ভালো হত। ছিটকে গিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ায় তক্ষুণি—সরে আসে মৃতদেহের কাছ থেকে।

হিমেল স্রোত নেমে যায় শিরদাঁড়া বেয়ে।

সেই প্রথম চোখ পড়ে বেসিনের পাশে কাটিং বোর্ডের ওপর। সেখানে রয়েছে চারটে বড় আলু, অর্ধেক কাটা কপি, একটা থলি, খানকয়েক গাজর, একটা লম্বা ছুরি, খোসা ছাড়ানোর একটা বিশেষ ছুরি। রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল বাসন্তী—মরেছে তক্ষুণি। আচমকা। জিনিসপত্র সরিয়ে রাখবারও অবসর পায়নি। খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে হঠাৎ আছড়ে পড়েছে দুই বেসিনের মাঝের জায়গায়।

প্লেগ নয় তো?

প্লেগ—বিউবোনিক অথবা অন্য ধরনের—মানুষের আস্তানায় হানা দিয়েছে বহুবার পৃথিবীর নানান অঞ্চলে। এ অঞ্চলে তার আদিম নৃত্য কখনও ঘটেছে বলে মাধবীর জানা নেই—সম্প্রতিও কোনও কেস মাধবীর গোচরে আসেনি। এলেও তার চিকিৎসা আজকাল আর দুর্ঘট নয়। কিছু প্লেগের ক্ষেত্রে চামড়ায় পেটেকিয়া দেখা দেয়। ছোট ছোট লালচে-বেগুনি স্পট। রক্তক্ষরণের জন্যে। কখনও দাগগুলো কালচে মেরে যায়—গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগে একেই বলা হত 'ব্ল্যাক ডেথ'—কালো মৃত্যু। কিন্তু বাসন্তীর গোটা দেহ যেভাবে কালো হয়ে গেছে—যেভাবে মসীবর্ণ ধারণ করেছে—নিশ্চয় অগুন্তি পেটেকিয়া থুকথুক করছে চামড়ার প্রতিটি লোমকূপে। তা কি সম্ভব?

তা ছাড়া, হঠাৎ মারা গেছে বুড়ি। প্লেগ কক্ষনো নয়। কোনও সংক্রামক ব্যাধিই নয়।

মারধরের চিহ্ন নেই। রক্ত ঝরছে না কোত্থাও। গুলিবিদ্ধ হলে ক্ষত থাকত—তা-ও নেই। ছুরিকাঘাতের ছিদ্রও নেই। গলা টিপে ধরা হয়নি। পিটিয়ে নিকেশ করার কোনও লক্ষণ নেই।

ডেডবডিকে একপাক ঘুরে নিয়ে বেসিনের পাশে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায় মাধবী। ফুলকপির গায়ে আঙুল ছুঁইয়েই চমকে ওঠে। এখনও কনকনে ঠান্ডা। খুব জোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফ্রিজ থেকে বের করে রাখা হয়েছে কাটিং বোর্ডে।

বুড়ি মরেছে একঘণ্টার মধ্যেই। শরীর এখনও উষ্ণ থাকা উচিত। কিন্তু মরল কীভাবে? মারল কে?

পরিকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে এল মাধবী। একটা অনিশ্চিত নৈঃশব্দ্য চেপে বসেছে গোটা বাড়িতে। হলঘরের কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময়ে জুতোর ঘষটানি লেগে যে ফিসফিসানি—তাও যেন বজ্রধ্বনির মতন জোরালো শোনাচ্ছে কানে।

মাধবীর এই অফিসঘর ইদানীংকালের ডাক্তারদের মতন নয়। অত্যাধুনিক। ঘরের মাঝখানে একটা মস্ত টেবিল। পরিকে সেখানে বসিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিল মাধবী—উদ্দেশ্য, শিবালয় টাউনের শেরিফকে ফোন করবে। কিন্তু ডায়ালটোন পাওয়া গেল না। খুব নরম একটা হিস-হিস শব্দ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। রিসিভার রেখে দিয়ে ফের তুলল মাধবী। সেই একই হিসহিস আওয়াজ। টেলিফোনও মরে গেছে।

এ বাড়িতে আর নয়। একটা মুহূর্তও আর নয়। উঠে দাঁড়ায় মাধবী, ‘পরি, চল।’

‘কোথায়?’

‘পাশের বাড়িতে। ফোন করব। এ ফোন ডেড।’

আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে খুলে দেয় মাধবী। বুক ধড়াস ধড়াস করছে। বিকটদেহী নিশ্চয় কাউকে দেখবে দাঁত খিচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে।

কেউ নেই। ঘর ফাঁকা।

দ্রুত এগিয়ে গেল দু-জনে। হলঘরের বাঁদিকে রয়েছে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। মাধবী চেয়ে ছিল সেই দিকেই। কিন্তু সিঁড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে এল না কোনও নরখাদক।

কেউ নেই সিঁড়িতে। কেউ নেই হলঘরে। কেউ নেই গাড়িবারান্দায়।

বাইরের গোধূলি দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে রজনীর আবির্ভাবে। লক্ষ লক্ষ বিবর থেকে লক্ষ লক্ষ ছায়া। দানবরা গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে দিবসের অবসান ঘটাবে বলে। এখুনি নিশ্ছিদ্র তমিস্রার আবির্ভাব ঘটবে গোটা শহরে।

বড়জোর আর দশ মিনিট।



সূর্য মজুমদার বাড়ি করেছিলেন খাসা। মাধবীর বাড়িকে ম্লান করে দিয়েছিলেন নকশার বাহাদুরিতে। পাশাপাশি দুটো বাড়ি। মাধবীর বাড়ি ছিমছাম। সূর্য মজুমদারের বাড়ি দেখলে চোখ কপালে ওঠে।

ডোরবেল পুশ করল মাধবী। মোলায়েম বাজনা বেজে উঠল ভেতরে। দরজা ছেড়ে একটু সরে এল—নিজের বাড়ি থেকে যদি কোনও ভাইরাস নিয়ে এসে থাকে—প্রতিবেশীর বাড়িতে তা ঢোকাতে চায় না। দরজায় কেউ এসে দাঁড়াল না। একসময়ে থেমে গেল মিউজিক। বেজে চলল কেবল ক্লাসিক্যাল মিউজিক। বিঠোফেনের মিউজিক। সূর্য মজুমদার বোধহয় মোহিত হয়ে রয়েছেন সুরের জগতে।

আবার বেল টেপে মাধবী। ডোরবেল মিউজিক বাজল, ধাপে ধাপে ফুলল, ধাপে ধাপে কমল, থেমে গেল। কেউ এল না দরজায়।

বেজে চলেছে বিঠোফেন।

'বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে,' বললে পরি।

'কেউ না থাকলে আলো জ্বলছে কেন, মিউজিক চলছে কেন?'

আচমকা একটা ঘূর্ণিঝড় তোলপাড় করে দিল গাড়িবারান্দার খানিকটা জায়গা। বাতাসের ঘুরন্ত ব্লেডে ছিঁড়েখুঁড়ে গেল মিষ্টি বিঠোফেন মিউজিক। বেতাল বাজনা খচমচ করে আছড়ে পড়ল কানে।

মাধবী ঠিকরে গেল দরজার সামনে। এক ঠেলায় দু'হাট করে দিল পাল্লা। আলো জ্বলছে স্টাডিরুমে—হলঘরের বাঁদিকে। দুধেলা প্রভা স্টাডির খোলা দরজা পেরিয়ে এসে পড়েছে হলঘরে—অন্ধকার লিভিংরুমের কিনারা পর্যন্ত!

'পরমা? কুশল?' ডাক দেয় মাধবী।

সাড়া নেই।

বিঠোফেনের বাজনা ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। ঘূর্ণিবায়ু প্রশমিত হয়েছে। মিউজিক তাল ফিরে পেয়েছে।

গলা চড়ায় মাধবী, 'সাড়া নেই কেন? বাড়ি কি খালি?'

সিম্ফনি শেষ হয়ে গেল। নতুন মিউজিক আর শুরু হল না। নৈঃশব্দ্য।

'সূর্যবাবু, আপনি কোথায়?'

গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। রজনী গাঢ়তর হচ্ছে।

পরি ঠোঁট কামড়ে ধরেই ছেড়ে দিল।

বললে, 'দিদি, কিছু বুঝতে পারছ?'

মাধবীও তা উপলব্ধি করছিল। বললে আস্তে, 'হ্যাঁ, পারছি। এখানে আর কেউ বা কারা রয়েছে। তাদের দেখা যাচ্ছে না।'

পেছনের লনে কেউ নেই। জানলার কাচের আড়ালে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি? বাইরে থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে না—ভেতর থেকে সে কিন্তু দেখছে দুই বোনকে—মুখে চাবি দিয়ে। কিন্তু কেন?

শরীরের জার্মস পাছে বাড়ির মধ্যে চালান হয়ে যায় বলে এতক্ষণ দ্বিধা করেছিল মাধবী, এখন আর করল না। পরির হাত ধরে ঢুকল বাড়িতে। দাঁড়াল হলঘরের ঠিক মাঝখানে। বাঁদিকের দরজা খোলা—দুটো আলো জ্বলছে সে ঘরে। সব কিছুই দেখা যাচ্ছে—শুধু মানুষ ছাড়া। ঘর ফাঁকা। সূর্য মজুমদারের ফ্যামিলির কেউ নেই ও ঘরে।

তা সত্ত্বেও প্রত্যেকের নাম ধরে ধরে ডেকে গেলে মাধবী। ফিরে এল প্রতিধ্বনি। নৈঃশব্দ্য যেন ওঁত পেতে রয়েছে মওকার অপেক্ষায়। এখুনি দেখা যাবে তার কায়া—অতিবড় দুঃস্বপ্নেও যে কায়াকে কল্পনা করা যায় না।

হলঘরের ডানদিকের লিভিংরুমে থই থই করছে তমিস্রা। দরজা ভেজানো রয়েছে। তবুও সেইদিকেই এগিয়ে গেল মাধবী। দরজার পাশের সুইচ টিপে আলো জ্বালল। কেউ নেই লিভিংরুমে। এ ঘরেই রয়েছে টেপডেক আর স্টিরিয়ো রেকর্ড প্লেয়ার। বিঠোফেনের মিউজিক বাজছিল এখানেই। গান চালু করে দিয়ে সপরিবারে বেরিয়ে গেছেন সূর্য মজুমদার।

এ ঘরের পাশেই ডাইনিং রুম। ডাবল ডোর ঠেলে ঢুকল মাধবী।

না, এখানেও কেউ নেই। ওপরে জ্বলছে ঝাড়লণ্ঠন—নিচের টেবিলে সাজানো চারজনের খাবার। শরবতে ভাসছে বরফের টুকরো—এখনও গলে যায়নি। মাংস ঠান্ডা মেরে এলেও এখনও চর্বির স্তর পড়েনি।

খুব জোর আধঘণ্টা আগে লোক ছিল এ ঘরে। খাওয়া চলছিল। তারপরেই আচমকা চারজনেই চলে গেছে। একখানা চেয়ার উলটে রয়েছে। চেয়ারের পাশে পড়ে রয়েছে একটা চামচ—ঘরের কোণে আর একটা।

নিশ্চুপ দুই বোন। অসহ্যতর হয়েছে সেই অব্যাখ্যাত অনুভূতিটা—নজরে রাখা হয়েছে দুজনকেই—তাদের দেখা যাচ্ছে না—তারা কিন্তু পলকহীন নয়নে দেখছে মাধবী আর পরিকে।

প্যারানোইয়া—মনের রোগ—মনকে প্রবোধ দেয় মাধবী।

পরি কিন্তু ফিসফিস করে বলে অন্য কথা, 'বার্মুডা ট্র্যাঙ্গেল' বইটা পড়েছ? মেরী সিলেস্টি... বড় জাহাজ... পাল তোলা... ১৮৭০ সাল কি ওই সময়ের কথা... হঠাৎ জাহাজটাকে ভাসতে দেখা গেছিল আটলান্টিকের মাঝখানে... টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে... কিন্তু মাঝিমাল্লা সব উধাও হয়ে গেছে... ঝড়ে জখম হয়নি জাহাজ... খোলে ফুটো হয়নি... লাইফবোট জাহাজেই রয়েছে... আলো জ্বলছে... পাল খাটানো রয়েছে... কোনও কারণ ঘটেনি জাহাজ ছেড়ে চলে যাওয়ার... অথচ খেতে বসেও কেউ খায়নি—আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেছে... ঠিক এই ঘরের চারজনের মতন।

শুকনো হেসে মাধবী বললে, 'বই পড়ে তোর মাথা বিগড়েছে। এখানে ও সব মিস্ট্রি নেই। হাওয়ায় মিলিয়ে যায়নি চারজনে।'

'তাহলে গেল কোথায়?'

এ বাড়ির দস্তুরই আলাদা। টেলিফোন থাকে রান্নাঘরে। খাবার ঘরের দরজা ঠেলে সে ঘরে ঢুকল দুই বোন। সুইচ টিপে আলো জ্বালল মাধবী। টেলিফোন রয়েছে বেসিনের পাশে দেওয়ালের তাকে। রিসিভার তুলে নিয়ে কানে লাগিয়ে রইল মাধবী। ডায়াল টোন আসছে না। টেলিফোন মরে গেছে।

কিন্তু একেবারে ডেড হয়নি। তাহলে কোনও শব্দ শোনা যেত না। নিজের বাড়িতে টেলিফোন তুলেও ডায়াল টোন পায়নি, শুধু একটা নরম হিসহিস আওয়াজ ছাড়া কোনও শব্দ শুনতে পায়নি। কিন্তু এখানকার লাইন সে রকম নয়, ওপেন লাইন—ইলেকট্রনিক স্ট্যাটিক্স-এর নরম হিসহিস শোনা যাচ্ছে। ডেড হলে এ-আওয়াজ তো শোনা যেত না।

রিসিভারের তলায় স্টিকারে লেখা রয়েছে দমকল আর পুলিশের ফোন নাম্বার। ডায়াল টোন না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ নাম্বারের বোতামগুলো টিপে গেল মাধবী।

কিন্তু কানেকশন পেল না।

ফের একই নাম্বারের বোতামগুলোয় আঙুল চালানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার আগেই মনে হল, টেলিফোনে কেউ যেন আড়ি পেতে রয়েছে। কান খাড়া করে শুনছে।

'হ্যালো!' ডাক দেয় মাধবী।

বহুদূরের সেই স্ট্যাটিক শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

টেলিফোনের লাইন 'ওপেন' থাকলে নিশ্চয় এইরকম আওয়াজই শোনা যায়—মনে মনে বলে মাধবী। লাইন 'ক্লোজড' হলে কোনও আওয়াজ শোনা যেত না।

কেউ যেন লাইনের অপর প্রান্তে বসে রয়েছে। মটকা মেরে রয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। মাধবীর প্রতিটি কথা গিলে গিলে খাচ্ছে। নিজে টুঁ শব্দ করছে না।

এমন শীতে গা-ঘামার কথা নয়। মাধবীর গা কিন্তু ঘেমে ওঠে। চাপা চিন্তাটা ঠেলে ঠেলে ওপরে উঠে আসতে চাইছে। মুখে বলল, 'ননসেন্স।' বলেই, নামিয়ে রাখল রিসিভার।

টেলিফোনের অপর প্রান্তের নীরব লোকটার ব্যবহার বিচলিত করেছে মাধবীকে। সে কি এই বাড়িরই কোথাও ঘাপটি মেরে রয়েছে? এই টেলিফোনের এক্সটেনশন লাইন কি বাড়ির অন্য ঘরে আছে? সেইখানে বসে রয়েছে রহস্যময় আততায়ী?

হুঁশিয়ার হল মাধবী। গা হিম হয়ে আসছে। তীব্রতর হচ্ছে অনুভূতিটা। অদৃশ্য সত্তা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছে। তার ধৈর্য ফুরিয়ে আসছে।

দ্রুত চরণে বাড়ির বাইরে চলে এল দুই বোন। শিবালয় টাউনের রাস্তায় রাস্তায়, বাড়িতে বাড়িতে আলো জ্বলছে। আলো জ্বেলে ঘুমোচ্ছে গোটা শহর। ঘুমপাড়ানি বাতাস বয়ে যাচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে।

হাঁটাপথে দুজনে এগিয়ে যায়। পুলিশ ফাঁড়ির দিকে।

ফাঁড়িতে ঢুকেই দেওয়ালের সুইচ টিপেছিল মাধবী—জ্বলে উঠেছিল মাথার ওপরকার আলো। তৎক্ষণাৎ তেউড়ে গেছিল মাধবীর গোটা শরীর।

সুমন্ত সেন লম্বমান রয়েছে মেঝের ওপর। নীলচে-কালচে কালসিটেমারা থেঁতলানো দেহ। ফুলে ঢোল। প্রাণহীন।

পরি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গেছিল। দাঁড়িয়েই রইল।

বাসন্তীর মৃতদেহে যে-যে অবস্থা দেখে এসেছে মাধবী, সেই সব অবস্থাই রয়েছে সুমন্তর দেহে। তবে একটা জিনিস অতিমাত্রায় পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে চোখের তারায় তারায়, আতঙ্ক। নিবিড় আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে গেছিল সুমন্ত সেনের মতন

ডাকাবুকো মানুষ। নিঃসীম আতঙ্কর তুহিন-মুষ্টি নিমেষে প্রাণহরণ করে নিয়ে গেছে সুমন্তর—ঠিক যেরকমটি ঘটেছে বাসন্তীর ক্ষেত্রে।

কোমরে বাঁধা রয়েছে হোলস্টারের বেল্ট। খাপের রিভলভার পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

নির্নিমেষে চেয়ে রইল মাধবী অস্ত্রের দিকে। মেঝেতে আছড়ে পড়েছিল সুমন্ত। সেই সময়ে রিভলভার খাপ থেকে ছিটকে পড়তে পারে মেঝের ওপর। কিন্তু মাধবীর তা মনে হল না।

সুমন্তই নিশ্চয় রিভলভার খাপমুক্ত করেছিল আততায়ীকে রুখে দেওয়ার জন্যে। তাই যদি হয়, তাহলে বিষ অথবা ব্যাধি—এই দুটোর কোনওটাই খতম করেনি সুমন্তকে।

তবে সে কে? অথবা, কী?

পরি দাঁড়িয়ে রইল দরজায়।

মাধবী ভাবছে। শিবালয় শহরের এই রহস্যময় মৃত্যু-অপদেবতার অকস্মাৎ নৃত্যের হেতু তাকে নির্ণয় করতেই হবে।

দীর্ঘ কয়েকটা সেকেন্ড ধরে নিরীক্ষণ করে গেল মারণাস্ত্রটাকে। আসন্ন মৃত্যুর দংষ্ট্রা থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল সুমন্ত। নিমেষে রিভলভার টেনে বের করেছে। তারপর?

নিকষ অস্ত্র মেঝে থেকে তুলে নিয়ে হাতের চেটোয় শোয়াল মাধবী। ছ-রাউণ্ড ক্যাপাসিটির সিলিণ্ডার। কিন্তু শূন্য রয়েছে তিনটে চেম্বার। পোড়া গান-পাউডারের কড়া গন্ধ গন্ধেন্দ্রিয়তে ধরা পড়ছে। তার মানে গুলি চলেছে সম্প্রতি। নইলে পোড়া গন্ধ এত তীব্র হত না। হয়তো আজকেই। বারুদের গন্ধ এত উৎকট যখন, তখন হয়তো ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই।

রিভলভার হাতে নিয়েই ঘরে চক্কর মারে মাধবী। চোখ আটকে যায় তিন জায়গায়। তিনটে তামার খোল। কার্তুজ। ভেতরে নেই বারুদ। নেই সিসে। কাজ শেষ করে মারণ বুলেটের খোল তিনটে গড়াগড়ি যাচ্ছে নীল মেঝের ওপর। কিন্তু কোনও বুলেটই নিক্ষিপ্ত হয়নি মেঝে লক্ষ করে। যদি হত, মেঝেতে ফুটো থাকত। দেওয়ালেও নেই বুলেট চিহ্ন, নেই কড়িকাঠে। মারণ-ধাতু আঘাত হানেনি কোথাও! আজব রহস্য!

জানলার কাচ অটুট... ভাঙেনি ফার্নিচার! তাজ্জব ব্যাপার!

সুমন্ত সেনকে আগে থেকেই চেনে মাধবী। ওর গুলি কখনও ফসকায় না। কথা বলতে বলতে খাপ থেকে রিভলভার টেনে পর-পর ছ'বার গুলি করে ছ'জনকে খতম করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এখানে ছুঁড়েছে তিনটে বুলেট, তারপর আর

সময় পায়নি—নিজেই খতম হয়েছে। কিন্তু বুলেট তিনটে নিশ্চয় তিনজনকে বিঁধেছে। রক্তপাত ঘটেনি কেন?

স্খলিত চরণে ভেতরের ঘরে সুমন্তর টেবিলে গিয়ে দাঁড়ায় মাধবী। এ ঘরের ফ্লোরেসেন্ট টিউব জ্বালাই ছিল। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে টেলিফোন। তুলে নেয় মাধবী।

ডায়াল টোন নেই। আগের দু'বারের মতন এবারেও একটানা ইলেকট্রনিক হিসহিসানি। যেন বহু পতঙ্গ মূঢ়পন্থায় সবেগে ডানা চালনা করে চলেছে। অর্থহীন সেই শব্দই বলে দিচ্ছে—লাইন ক্লোজড নয়, ওপেন রয়েছে। আর ঠিক আগের মতনই মনে হচ্ছে, লাইনের অপর প্রান্তে বাকহীন এক বদমাশ কানের পর্দায় রিসিভার লাগিয়ে বসে রয়েছে। সজোরে রিসিভার নামিয়ে রাখে মাধবী।

ঘরের পেছন দিককার দেওয়ালে রয়েছে রেডিয়ো আর টেলিটাইপ লিঙ্ক। মাধবী জানে না কী করে অপারেট করতে হয় টেলিটাইপ। খুটখাট করেও পারল না রেডিয়ো-কে মুখর করতে। অথচ, পাওয়ার সুইচ অন পজিশনে রয়েছে। ইন্ডিকেটর ল্যাম্প কিন্তু জ্বলছে না। মাইক্রোফোনও ডেড। সব যন্ত্রই ডেড।

দরজার বাইরে পরির পাশে গিয়ে দাঁড়ায় মাধবী। খোয়া চাঁদ উঠেছে আকাশে। পাহাড়ের মাথায়। রাস্তার ল্যাম্পের আলো যেখানে পৌঁছোতে পারছে না, চাঁদের মরা আলো ছায়ামায়ায় ঘিরে রেখেছে সেই সব অঞ্চলকে। এর বেশি কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রুপোলি চাদরে গা মুড়ে যেন অনেক অজানা ভয়ংকর ওঁত পেতে রয়েছে—নির্নিমেষে দুই বোনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারা অস্পষ্ট, কিন্তু অনস্তিত্ব নয়। তারা অদৃশ্য, কিন্তু অ-প্রাণ নয়। তারা অ-জড়, কিন্তু কুহেলী নয়। তারা শুধু আতঙ্ক—কল্পনাতীত, বর্ণনাতীত।

'গোরস্থান,' ফিসফিস করে বললে পরি, 'গোটা শহরটাই একটা গোরস্থান।'



শিবালয় অ্যাভিনিউ ধরে হেঁটে চলেছে দুই বোন। মাধবীর হাতে রয়েছে সুমন্তর রিভলভার। তিনটে গুলি ভরা আছে। তাই যথেষ্ট। বাড়ির পর বাড়িতে উঁকি মেরে যাচ্ছে, বেল বাজাচ্ছে, কড়া নাড়ছে—কেউ সাড়া দিচ্ছে না। আলো জ্বলছে বাড়ির মধ্যে—অথচ শ্মশান—নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে ভেতরে।

পরি বলল, 'দিদি, হঠাৎ সবাই মরে গেছে। কেন?'

মাধবী বললে, 'সেটাই ভাবছি। রেডিয়েশনের জন্যে নিশ্চয় নয়—সেক্ষেত্রে শরীর পুড়ে যেত। দগদগে ঘা দেখা যেত। বিষের জন্যেও নয়—গোটা শহরটায় একসঙ্গে বিষের কাজ হতে পারে না। ফুড পয়জনিং-ও নয়—শহরের সমস্ত লোক একই পয়জনড্ ফুড একই সময়ে খেয়ে ফেলল, তা হয় না। জলের বিষও নয়—ঘড়ি ধরে শহরসুদ্ধ লোক বিষ-জল খেল একই সময়ে? অসম্ভব।'

কথা বলতে বলতে 'আহার্য নিবাস'-এর সামনে এসে পড়েছে দুই বোন। এখানকার কেক, ব্রেড, প্যাসট্রি, প্যাটিস খুব নামকরা। মালিক রজনী শিকদার নিজেই বানান। দোতলায় থাকেন। ওঁর বউয়ের নাম মনোরমা।

বড় জানালার কাচে কপাল ঠেকিয়ে দেখল মাধবী—সেলসরুমের টেবিল-চেয়ার দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কেউ নেই।

পরি বললে, 'বিষাক্ত গ্যাসের জন্যে নয় তো?'

মাধবী বললে, 'এদিকের পাহাড়ে কোনও ফ্যাক্টরি নেই। টক্সিক জঞ্জাল নেই। বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হবে কী করে?'

আলো জ্বলছে 'আহার্য নিবাস'-এর রান্নাঘরে। ঢুকতে গেল মাধবী। কিন্তু তালা দেওয়া ভেতর থেকে।

'পেছন দিক দিয়ে ঢুকব,' বলে কাঠের ফটকের দিকে পা বাড়ায় মাধবী। তৈলহীন কব্জা আর্তনাদ করে ওঠে ঠেলা খেয়ে।

ভেতরে একটা টানা লম্বা গলিপথ। একদিকে বিউটি পার্লার। আর একদিকে আহার্য নিবাস। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বহুদূরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা আলো।

অন্ধকার গলিপথ নিছক তমিস্রায় ঠাসা নয়। তমিস্রার গর্ভে ওঁত পেতে রয়েছে যেন আরও অনেক কিছু। প্রতি পদক্ষেপে সঙ্কীর্ণতর হচ্ছে গলিপথ—বাড়ছে দুই বোনের বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ার আওয়াজ।

সিকিপথ এসেই মনে হল, সুড়ঙ্গে শুধু ওরা দু'জন নেই আরও অনেকে আছে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সজীব হয়ে উঠল মাথার ওপরকার ছাদ। দশ-বারো ফুট ওপরকার কড়িকাঠে কারা যেন সঞ্চরমান হয়েছে। অন্ধকার সবচেয়ে জমাট হয়েছে মাথার ওপরেই। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অথচ মনে হচ্ছে, কিছু একটা রয়েছে সেখানে—একটা নয়, অনেক... অগুন্তি... চোখ নিয়ে না দেখেও তাদের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যাচ্ছে। পেছনে না তাকিয়েও পিছু নেওয়া বদমাশ লোককে যেমন টের পাওয়া যায়—ঠিক সেইভাবে। অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য চমকে চমকে উঠছে শুধু দুই বোনের পা ফেলার আওয়াজে। সুড়ঙ্গের শেষের দিকে ম্যাড়মেড়ে আলোর দিকে জোরে পা চালিয়ে মাধবী ঘাড় বেঁকিয়ে তাকিয়েছিল ওপরের কয়লার মতন কালো কড়িকাঠের দিকে—আড়ষ্টভাবে। সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট দেখেছিল—তরল আলকাতরার মতনই সরে সরে যাচ্ছে নিরেট অন্ধকার। কায়া পালটাচ্ছে।

অন্ধকারের কায়া। শিউরে ওঠে মাধবী। কিন্তু চোখ নামাতে পারে না। সঞ্চরমান তরল তমিস্রা দেখেই যাচ্ছে আতঙ্ক-অবশ দুই চোখে। মাথার ওপর আছে মাচা—কড়িকাঠের দু'পাশে। এই দুই সারি মাচার মধ্যেই চলেছে পুঞ্জীভূত ছায়াদের নড়াচড়া—কায়াগ্রহণ...

মনের ভুল অবশ্যই। চোখের ভুল নিশ্চয়। দৃষ্টিভ্রম নির্ঘাৎ। এরকম ভুল সব মানুষই দেখে—ভয়-পঙ্গু মন চোখকে দিয়ে দেখায়—যার অস্তিত্ব নেই সেই ভয় ধরানো ভয়ানককে।

সুড়ঙ্গপথের অর্ধেক অতিক্রম করে এসেছে মাধবী। বাকি আর অর্ধেক। কিন্তু অকস্মাৎ পা বিদ্রোহী হচ্ছে কেন? কেন প্রচণ্ড বাসনা হচ্ছে, পেছন ফিরেই চম্পট দেওয়ার? অন্তরের গোপন গুহা থেকে নিরন্তর উঠে আসছে একটাই সতর্কবাণী—

আর এগিও না... আর এগিও না... ওখানে আছে বিপদ—আছে মহা ভয়ংকর... আছে অপার্থিব বিভীষিকা...

ছুটে বেরিয়ে গেলেই হয়। এই সুড়ঙ্গে আর এক মুহূর্তও নয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে দৌড়োও!

অসম্ভব! মাধবী লাহা পাশ করা এবং পশার জমানো সফল চিকিৎসক। প্যানিক জিনিসটা ডাক্তারদের মানায় না।

দূরের বিষণ্ণ আলো এখন অনেক কাছে এগিয়ে এসেছে। পেছনের অন্ধকারই বরং অনেকটা পথ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে। অজান্তেই পদক্ষেপ দ্রুততর করে মাধবী। তারপর দৌড়ায়। ঊর্ধ্বশ্বাসে বাকি পথটুকু পেরিয়ে এসে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে আলোর রাজ্যে।

পরি হুমড়ি খেয়ে পড়ে মাধবীর গায়ে। এক হাতে তাকে সিধে করে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, আর এক হাতে রিভলভার তুলে মাধবী ঘুরে দাঁড়ায় অন্ধকার ঢাকা সুড়ঙ্গপথের দিকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পরি বলে, ‘টের পেয়েছ?’

‘পেয়েছি। কড়িকাঠের ঠিক নিচে। পাখি-টাখি হবে, অথবা বাদুড়।’

‘না... না... সিলিং-এর নিচে নয়। দেওয়ালের গা ঘেঁষে... গুঁড়ি মেরে ছিল।’

‘কিন্তু আমি তো দেখলাম, মাচার মধ্যে কী যেন নড়ছে।’

‘না দিদি, দেওয়ালের গা ঘেঁষে।’

‘কী?’

‘স্পষ্ট দেখিনি।’

‘শুনেছিস কিছু?’

‘গন্ধ-টন্ধ কিছু?’

‘না... তবে... অন্ধকার কি নড়ে?’

‘আমিও তাই দেখেছি—মাচায়।’

নির্নিমেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে সুড়ঙ্গের দিকে। ঘাপটি মেরে যারা এতক্ষণ অবলোকন করেছে দুই সহোদরাকে—এবার নিশ্চয় বায়ুবেগে তাদের আবির্ভাব ঘটবে সুড়ঙ্গের বাইরে। ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই যাতে অনলবর্ষী চোঙা থেকে মারণ বুলেট ধেয়ে যেতে পারে, তার জন্যে তৈরি মাধবী। চোয়াল শক্ত। কিন্তু তমিস্রার জঠর ফুঁড়ে ধেয়ে এল না কোনও বিভীষিকাই।

মাধবী বললে, ‘শুধু শুধু দৌড়োলাম। সত্যিই যদি কিছু থাকত, এতক্ষণে বেরিয়ে আসত বাইরে।’

‘হয়তো।’

‘এখনও ঘোর কাটেনি তোর?’

এক ঝাপটা ঠান্ডা হাওয়া আচমকা তোলপাড় করে দিয়ে যায় সুড়ঙ্গ পথ।

‘বেড়াল নিশ্চয়,’ বললে মাধবী।

‘বেড়াল নয়,’ পরির জবাব।

‘বেড়ালের চেয়ে বড়... অনেক বড়।’

‘ঠিক আছে। চল, ভেতরে ঢোকা যাক,’ আহার্য নিবাসের খিড়কির দরজার দিকে এগোয় মাধবী—পরি বারবার পেছন ফিরে চাইছে।

দরজা খোলা রয়েছে। ভেতরে আলো জ্বলছে। সরু লম্বা ভাঁড়ার ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে দু-জনে। পাশের ছোট দরজার পরেই বিরাট কিচেন। মশলার সুবাস ভেসে আসছে। সুগন্ধে ঈষৎ ফিকে হয়ে আসে টেনশন।

রয়েছে দুটো ওয়াশ-বেসিন, একটা ফ্রিজ, কয়েকটা ওভেন, বেশ কয়েকটা স্টোরেজ ক্যাবিনেট, ময়দা ঠাসবার একটা মেশিন—এ ছাড়াও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা লম্বা কাউন্টার। বেশ চওড়া। খুচখাচ কাজ করা হয় এর ওপরেই। এই কাউন্টারের একটা দিক চকচকে স্টেনলেস স্টিলের পাত দিয়ে ঢাকা—আর একটা দিকে কাঠের পাটাতন পাতা। মাংস কাটার জায়গা। চকচকে স্টিল রয়েছে যেদিকে ভাঁড়ার ঘরও সেদিকে। এই দিক দিয়েই কিচেনে ঢুকছে দুই বোন। ইস্পাতের পাতের ওপর সাজানো বিস্তর বাসনকোসন—পরিষ্কার ঝকঝক করছে। গোটা কিচেন জুড়ে শুধু চেকনাই।

কেউ নেই ঘরে।

গোটা শরীরে যেন ইলেকট্রিক শক বয়ে গেল সেই মুহূর্তে। জড়ো করা বাসনকোসনের ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে কাউন্টারের মাঝখানটা। এক তাল ময়দার ওপরে গাঁথা একটা কাঠের বেলুন—লেচি পাকানোর আগের অবস্থা। দুটো হাত ধরে রয়েছে বেলুনের দু’দিক। শুধু দুটো হাত কব্জি পর্যন্ত রয়েছে। কব্জির পর থেকে হাতের বাকি অংশ আর নেই।

সবেগে পেছিয়ে এসেছিল পরি। মেটাল ক্যাবিনেটে পিঠ আছড়ে পড়ায় ঝনঝন করে উঠেছিল ভেতরকার জিনিসপত্র। ধারালো ক্ষুরের মতই নিদারুণ আতঙ্ক অকস্মাৎ বুঝি গলা চিরে দিয়ে যায় মাধবীর। এ কী সম্ভব?

স্তম্ভিত মাধবী এবার দু-পা এগিয়ে গেছিল ময়দার মণ্ডর দিকে। পা চলতে চাইছে না। কিন্তু যেন সম্মোহনের ঘোরে তাকে এগিয়ে যেতেই হচ্ছে। আরও কাছ থেকে দেখবার আত্যন্তিক বাসনায়।

শুধু দুটো হাত মণিবন্ধ পর্যন্ত। থেঁতলানো নয়, কালসিটে খাওয়া নয়, ফুলেও ওঠেনি। চামড়ার আভা সুস্পষ্ট—একটু যা ফিকে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়েছে সাদা

ময়দায়।

এই প্রথম রক্ত দর্শন করল মাধবী। কিন্তু রক্ত ওর চোখ টানছে না, টানছে হাতের উলটো পিঠের সাদা লোম, মোটা গাঁটওলা বেঁটে আঙুল। পুরুষের হাত। রজনী শিকদারের।

'দিদি!'

ডাক শুনে চমকে ওঠে মাধবী। হাত তুলে আঙুল-এর সংকেতে কিচেনের আর একটা দিক দেখাচ্ছে পরি।

তিনটে ওভেন রয়েছে সেদিকে—মাংসের কিমা বানানোর প্রান্ত যেদিকে—তারও ওদিকে—ঘরের একদম শেষদিকের দেওয়ালের গায়ে। একটা খুব বড়; নিরেট দুটো দরজার একটা ওপর দিকে, আর একটা নিচের দিকে, রয়েছে আরও দুটো ওভেন। সাইজে প্রথমটার চেয়ে ছোট, দুটোরই সামনে একটা করে পাল্লা। পাল্লার মাঝে কাচের চাকতি বসানো। এই চাকতি দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দুটো উনুনেরই ভেতরে বসানো রয়েছে দুটো মুণ্ড। গলা থেকে কাটা মুণ্ডু। একজন রজনী শিকদার। সাদা চুলে লেগে লাল রক্ত। বিষম যন্ত্রণায় চেপে ধরেছে দুই ঠোঁট। আর একটা মনোরমা শিকদারের। মুখ হাঁ করে রয়েছে—যেন চোয়াল খুলে ঝুলে পড়েছে।

বুক ধড়াস ধড়াস করছে। মাধবী চোখে ঝাপসা দেখছে। ময়দার মণ্ডর ওপর হাত দুটো বেলুন ধরে স্থির হয়ে রয়েছে বটে, কিন্তু আচমকা জীবন্ত কাঁকড়ার মতন শূন্যপথে ধেয়ে এলেও মাধবী আর অবাক হবে না।

গেল কোথায় শিকদারের কাটা ধড়গুলো? বড় উনুনের ভেতরে? দরজা বন্ধ তাই দেখা যাচ্ছ না? নাকি, ফ্রিজের মধ্যে?

দলা পাকিয়ে ওঠে মাধবীর গলায়। আগের সেই ভয়াল অনুভূতিটা ফের ফিরে এসেছে। কারা যেন নিষ্পলক চাহনি মেলে ওদের দেখে যাচ্ছে। সবেগে তাই ঘুরে দাঁড়ায় পরির দিকে, 'চ, এখানে আর নয়।'

বলেই, পরির হাত ধরে দৌড়ায়—অন্ধকার গলির দিকে নয়—সেলস রুমের দিকে। পৌঁছে যায় বাইরের দরজায়। ল্যাচ ঘুরিয়ে দরজা খুলে ছিটকে গেল বাইরের খোলা বাতাসে। ছুটে গিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ায় পাইন গাছের গুঁড়িতে।

ফিসফিস করে মাধবী বললে, 'আশ্চর্য! মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্ত রয়েছে কিচেনে। অথচ রক্ত থই থই করা উচিত ছিল।'

পরি বললে, 'ধস্তাধস্তির চিহ্নও নেই।'

'একটা জিনিসও ভাঙেনি—সরেনি,' ঢোক গিলল মাধবী।

যেন কলজে-মুক্ত হাওয়ার দমক ভেসে আসে শহরের দিক থেকে।

পরিকে পাশে নিয়ে হনহন করে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছে মাধবী। মনের চোখ থেকে তাড়াতে পারছে না সারিবদ্ধ বীভৎস দৃশ্যগুলো।

ওরা এখন শিবালয় অ্যাভিনিউর পুব ব্লকে। হিসেব-বিশেষজ্ঞ শান্তনু ব্যানার্জীর বাড়ির সামনে দাঁড়ায় মাধবী। ওঁর স্ত্রী শান্তা টুরিস্ট সিজনে কফি হাউস খুলে বসে। দুজনের ছোট্ট সংসার।

দুজনেই বাড়তি সময় কাটান শখের রেডিয়ো নিয়ে, এই তাঁদের একমাত্র হবি। বেতার বিজ্ঞানে দক্ষ দুজনেই। ওঁদের শর্টওয়েভ রেডিয়োটার কথা মনে পড়তেই মাধবী ছুটে এসেছে।

এক পাল্লার সদর দরজাটা ভেতর থেকে লক করা। আলো জ্বলছে ভেতরে অথচ পুশবেল টিপলেও কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

ঘুরে গিয়ে পৌঁছোল বাড়ির পেছনে। এখানেও আলো ঠিকরে আসছে হলুদ কাচের মধ্যে দিয়ে। রান্নাঘরের দরজাও লক করা ভেতর থেকে। জানলায় পর্দা টানা থাকায় ভেতরের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে না।

কাচে টোকা দিল মাধবী। সাড়া নেই।

শান্তনু ব্যানার্জী মিতব্যয়ী পুরুষ। গ্রীলের খরচ বাঁচিয়েছেন—জানলায় শুধু কাচের পাল্লা বসানো। এ শহরে চোর-ছ্যাঁচোড়ের উপদ্রবও নেই।

রিভলভারের বাঁট দিয়ে জানলার কাচ ভেঙে ফেলল মাধবী। হাত ঢুকিয়ে খুলল ছিটকিনি। পাল্লা টেনে খুলে আগে ঢুকল নিজে—পেছনে পরি।

ব্যানার্জী পরিবার রয়েছে এই ঘরেই। শান্তা চিত হয়ে শুয়ে মেঝেতে। শান্তনু বসে রয়েছেন চেয়ারে। সামনের টেবিলে তাঁর রেডিয়ো। মাথা হেলে পড়েছে তার ওপর। ঘাড় কাত হয়ে রয়েছে। তাই দেখা যাচ্ছে খোলা চোখের আতঙ্ক। একই আতঙ্ক জেগে রয়েছে শান্তার চোখেও। দুজনেরই সারা শরীর থেঁতলানো। কালসিটে পড়া ফুলে ঢোল। কিন্তু মরবার পরেও মুখের মাসল ঢিলে হয়ে যায়নি কারুরই।

শান্তনু ডান হাতের মুঠোয় ধরে রয়েছেন একটা মাইক্রোফোন। রেডিয়ো মেসেজ পাঠানোর চেষ্টা করেছিলেন। নিশ্চয় পারেননি, পারলে, এতক্ষণে পুলিশ এসে পৌঁছোত। রেডিয়ো নিষ্প্রাণ।

বিশেষ একটা দরজার গায়ে রচনা করা হয়েছে একটা ব্যারিকেড। এ দরজা ভেতর থেকে ঠেলে খুলতে হয়—ঘরটা ছোট্ট, বাজে জিনিসপত্র থাকে। ব্যারিকেড তৈরি হয়েছে এই দরজার গায়ে, যাতে ভেতর থেকে খোলা না যায়। চেয়ার, সোফা, টিভি এনে ঠেসে রাখা হয়েছে কপাটের গায়ে। নাইট-ল্যাচও নিশ্চয় আঁটা হয়েছে।

এত ভয় কেন? কাকে? কী আছে ওই ছোট্ট ঘরে? অথচ তাকে আটকে রাখা যায়নি। চেষ্টার কসুর করেননি কর্তাগিন্নি। আতঙ্ক কিন্তু ঢুকে পড়েছে এই ঘরে। সেই মুহূর্তেই বোধহয় শেষ চেষ্টা করেছিলেন। শখের রেডিয়ো সেট মারফত মেসেজ পাঠানোর শেষ চেষ্টা।

কিন্তু ঢুকল কী করে? জানলা তো বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। দরজার নিচে আধ ইঞ্চির মতন একটা ফাঁক রয়েছে বটে, কিন্তু সেখান দিয়ে এমন কী মহা আতঙ্ক প্রবেশ করল যে কলজে বন্ধ হয়ে গেল স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই? কড়িকাঠের কাছে লম্বায় চওড়ায় ইঞ্চিছয়েক ঘুলঘুলিটাতেও লোহার জাল বসানো।

মাধবী বললে, 'বাইরে চ, পরি।'

চৌকাঠ পেরতে যাচ্ছে দুজনে, ঠিক এই সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন। গোরস্থান-নৈঃশব্দে এই প্রথম আওয়াজ। হৃৎপিণ্ড ধড়াস করে উঠল দুজনেরই।

টেলিফোন বসানো রয়েছে রেডিয়োর পাশে। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল মাধবী, 'হ্যালো?'

কোনও প্রত্যুত্তর নেই। কে যেন কান খাড়া করে শুনছে মাধবীর কণ্ঠস্বর। দূরায়ত ক্ষীণ সমুদ্রোচ্ছাসের মতন অদ্ভুত একটা আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ ভেসে আসছে না কানে।

তর্ক-বিতর্ক চলছে মাধবীর মনের মধ্যে।

টেলিফোন করছে যে, সে মানুষ নয়!

ননসেন্স!

সে মানুষ নয়, জড়পদার্থও নয়, তার চেতনা আছে!

তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!

ভাষা দিয়ে তার কুটিলতাকে প্রকাশ করা যায় না—সে নিখাদ নির্মমতা!

থামো!

মনের সমস্ত জোর দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখতে যাচ্ছে মাধবী, এমন সময়ে ক্লিক করে উঠল টেলিফোন—ডায়াল টোন ফিরে এল পরক্ষণেই।

নিথর হয়ে যায় মাধবী। কী করবে এখন? পরক্ষণেই টিপে ধরে জিরো বাটন। রিং-এর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। মিষ্টি স্বাভাবিক আওয়াজ।

'অপারেটর স্পিকিং।'

'এমার্জেন্সি,' রুদ্ধশ্বাসে বলে যায় মাধবী, 'টিকেন্দ্রনগরে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে দিন—এখুনি।'



শিবালয় শহরের কর্তাব্যক্তিদের হেডকোয়ার্টার টিকেন্দ্রনগরে। যাঁর নামে নগরের নামকরণ, তাঁকে ইংরেজরা ফাঁসিতে লটকে দিয়েছিল ১৮৯১ সালে। তাঁর অপরাধ, বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। যুদ্ধে তিনি হেরে যান। মণিপুরের রাজা কীর্তিচন্দ্রের ছেলে বলেও তাঁকে খাতির করেনি পাষণ্ড ইংরেজ শাসক। টিকেন্দ্রনগরের ঠিক মাঝখানে রয়েছে তাঁর মর্মর-মূর্তি। বছরের একবার ফুলের পাহাড় জমে সেখানে। তাঁর মৃত্যুদিবসে।

পুলিশপ্রধান সুরেশ সাইকিয়ার ঘরে ঢুকলেন ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর বিশু বোস, 'মাধবী লাহা নামে কাউকে চেনেন?'

'কেন বলুন তো?'

'এইমাত্র ফোন করেছিলেন শিবালয় টাউন থেকে। ভদ্রমহিলা ডাক্তার?'

'হ্যাঁ। খুব পপুলার।'

'মাথা কি খারাপ?'

'কেন?'

'শিবালয় টাউনে নাকি কেউ বেঁচে নেই—উনি আর ওঁর বোন ছাড়া।'

জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল মাধবী আর পরি। বেরিয়ে গেল জানলা দিয়েই।

রাত আরও শীতল হয়েছে। বাতাসের গোঙানি আবার বেড়েছে।

মাধবী আগে গেল নিজের বাড়ি। দুটো কোট নিয়েই বেরিয়ে এল বাইরে। গায়ে দিয়ে চলে এল পুলিশ অফিসের সামনে। কাঠের বেঞ্চি রয়েছে রাস্তার পাশে। বসল সেখানে। এখন শুধু প্রতীক্ষা। টিকেন্দ্রনগর থেকে আসুক পুলিশবাহিনী।

'কতক্ষণ লাগবে, দিদি?' পরির প্রশ্ন।

'পঁয়তাল্লিশ মিনিট তো বটেই। বড় জোর এক ঘণ্টা। তিরিশ মাইল পথ—চড়াই-উৎরাই—নিজেদের রেডি করা... সময় তো লাগবেই।'

'ব্যানার্জীবাড়িতে কে টেলিফোন করেছিল?'

'কেউ না।'

'তুমি তো কান পেতে শুনছিলে?'

'শুনছিলাম না—কান খাড়া করেছিলাম।'

'তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, কেউ যেন তোমাকে ভয় দেখাচ্ছে?'

'ভয় পেয়েছিলাম কোনও আওয়াজ না পেয়ে। নো সাউণ্ড।'

কী বলবে মাধবী? ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় টের পেয়েছিল, একটা অপার্থিব সত্তা হাজির রয়েছে টেলিফোনের অপর প্রান্তে। পরিকে তা জানিয়ে লাভ কী?

খসখস করে একটা কাগজ উড়ে গেল রাস্তার ওপর দিয়ে। চাঁদের মুখ ঢেকে গেল কালো মেঘে।

ঝপ করে নিভে গেল শিবালয় টাউনের সমস্ত আলো।

লাল এমার্জেন্সি ফ্ল্যাশ দিয়ে যাচ্ছে তিনখানা পুলিশ গাড়ির মাথায়। ঝড়ের বেগে ধেয়ে যাচ্ছে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে—শিবালয় শহরের দিকে। দু'পাশে ঘন জঙ্গল। মাথার ওপর চাঁদ।

প্রথম ধাবমান গাড়িটা চালাচ্ছেন বিশু বোস। তাঁর পাশেই বসে রয়েছেন সুরেশ সাইকিয়া।

দ্বিতীয় গাড়িটায় বসে আছেন টম ডিক্সন। পুলিশ সার্জেন্ট। নরাকৃতি দানব বললেই চলে। গুলি চালায় নির্ভুল। কিন্তু তার একটা দোষ আছে। ক্ষণিকের দুর্বলতা যখন তাকে পেয়ে বসে তখন সে খুন করতে চায় না, নিজে খুন হয়ে যাবে জেনেও।

একদল নরঘাতক শিবালয় শহরকে শ্মশান বানিয়েছে শুনে সুরেশ সাইকিয়া সঙ্গে নিয়েছেন টম ডিক্সনকে। এবং, এই শীতেও ভয়ে ঘামছে টম ডিক্সন।

গোটা শিবালয় শহরের সমস্ত আলো নিভে গেল। অকস্মাৎ কমে এসেছে হাওয়ার বেগ। কালো মেঘ সরে গেছে চাঁদের মুখ থেকে।

বুক ধড়াস ধড়াস করছে মাধবীর। তাকিয়েছিল পেছন দিকে। ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেছিল পেছনে তাকাতে।

পুলিশ ফাঁড়ি আর তার পাশের কফি হাউসের মাঝখানের জায়গাটা বড় অন্ধকার। গাছপাতায় ছাওয়া যেন একটা সুড়ঙ্গ। ঠিক যেমনটি দেখে এসেছিল বেকারিতে। অন্ধকারের আতঙ্ক যেন গুঁড়ি মেরে বসে আছে ওইখানে।

বেঞ্চি থেকে ছিটকে গেছিল মাধবী। টেনে নিয়ে গেছিল পরিকে রাস্তার ঠিক মাঝখানে। এখানে চাঁদের আলো ফুটফুট করছে।

আচমকা জ্বলে উঠল রাস্তার সব আলো। বিদ্যুৎ-দ্যুতিতে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে না যেতেই ঝপ করে নিভে গেল আবার। সেই অন্ধকার। এখন আরও উৎকট।

একটা বিকট হাহাকার ভেসে গেল গোটা শহরটা ওপর দিয়ে—বুকচেরা এমন আর্তনাদ কোনও মানুষের গলা দিয়ে বেরতে পারে না। পরক্ষণেই সব নিস্তব্ধ। আবার সেই বিকট গোঙানি। নৈঃশব্দ্য।

এবার শব্দটাকে চিনেছে মাধবী। সাইরেন বাজছে। কখনও পুলিশ ফাঁড়িতে, কখনও দমকল-হাউসে। পরের মুহূর্তেই শোনা গেল ঢং... ঢং... ঢং... আওয়াজ! যেন, পাগলা-ঘণ্টি বাজছে। শিবমন্দিরে দড়ি ধরে টানা হচ্ছে... হচ্ছে... হচ্ছে...

বন্ধ দরজা আর জানলায় আছড়ে পড়ছে সেই শব্দ... মাথা কুটে ফিরে যাচ্ছে... শিবালয় অ্যাভিনিউ দিয়ে ধেয়ে যাচ্ছে...

আবার বেজে উঠল সাইরেন... থামতে না থামতেই ঘণ্টাধ্বনি... তারপরেই আবার সাইরেন... আবার ঘণ্টার সঙ্কেত...

সঙ্কেত! আসন্ন নতুন বিপর্যয়ের ছন্দময় সঙ্কেত!

দ্বিতীয় গাড়িটা চালাচ্ছে উজাগর সিং। ছিল আর্মিতে—এখন পুলিশে। চোখ শীতল। শরীর যেন পাথর কুঁদে তৈরি। রক্তে ডিসিপ্লিন।

উজাগরের পাশে গা এলিয়ে বসে রমেশ থাপা। চোখ মুখ শরীর কণ্ঠস্বর—সবই স্থূল। মোটা দাগের মানুষ। কথাবার্তা রুক্ষ।

ঝলসে উঠল রাস্তার ধারের মাইল পোস্ট হেডলাইটের ঘুরে যাওয়া আলোয়। মোড় নিয়েছে সামনের গাড়িটাও। আর মাত্র দু'মাইল বাকি...

তৃতীয় গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল এইখানেই, রাস্তা জুড়ে, প্ল্যানমাফিক। শহর থেকে যেন কেউ বেরতে না পারে।

এগিয়ে গেল সামনের গাড়ি দুটো।

ঘণ্টাধ্বনি আর সাইরেনের আর্তনাদ... ঘণ্টাধ্বনি আর সাইরেনের হাহাকার। তালে তাল মিলিয়ে আচমকা জ্বলে উঠছে সমস্ত আলো... নিভে যাচ্ছে পরক্ষণেই... আবার

জ্বলছে... আবার নিবছে...

মাথা ঘুরছে দুই বোনের... গোটা শহরটা বুঝি মাতাল হয়ে গেছে... উন্মাদ হয়ে গেছে... আওয়াজ... আলো... অন্ধকার... পায়ে পা মিলিয়ে রক্ত জমানো লাইট অ্যান্ড সাউন্ড ম্যাজিক রচনা করে চলেছে...

রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে দুই বোন। হঠাৎ সব স্তব্ধ হয়ে গেল। আওয়াজের স্রোত দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল। প্রতিধ্বনিও আর ফিরে আসছে না। শুধু জ্বলছে আলোর মালা রাস্তায়, ঘরে ঘরে—আর নিবছে না।

কবরখানার নৈঃশব্দ্যের মাঝে জাগ্রত হল একটা চাপা গজরানি... দূর থেকে এগিয়ে আসছে... আসছে...

দিদির হাত চেপে ধরেছে পরি। রিভলভার তুলে ধরেছে মাধবী শব্দ লক্ষ করে।

তারপরেই দেখা গেল শব্দের উৎস। রাস্তা বেয়ে উঠে আসছে দুটো গাড়ি। পুলিশের গাড়ি। মাথায় জ্বলছে আর নিবছে লাল আলো।

ওদের সামনেই ব্রেক কষল গাড়ি দুটো। টপাটপ নেমে দাঁড়াল ছ'জন পুরুষ। ঘিরে ধরল দুই বোনকে। কেউ কথা বলছে না। শুধু চেয়ে রয়েছে। দেখছে।

দেখছে মাধবীও। ওর মন বলছে, এরা কেউ জ্যান্ত ফিরে যাবে না। কেউ না।

সুমন্ত সেনের ডেডবডির পাশে এক হাঁটু পেতে বসে পড়েছিলেন সুরেশ সাইকিয়া। আঙুল ছোঁয়ালেন নীলচে-কালচে মুখে। অবাক হলেন।

'চামড়া তো এখনও গরম।'

'খুব বেশি আগে মারা যাননি,' মাধবীর মন্তব্য।

'কিন্তু মাত্র ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে কোনও বডি এভাবে ফুলে উঠতে পারে না। ডিসকালার্ড হয়ে যেতে পারে না,' বললেন বিশু বোস।

'এই শহরের সমস্ত ডেডবডির অবস্থা ঠিক এইরকম,' মাধবীর শক্ত জবাব।

ডেডবডি উলটে দিলেন সুরেশ সাইকিয়া। পিঠে নেই কোনও ক্ষত চিহ্ন।

মাথার খুলির পেছনে চোট লাগেনি তো? আছড়ে পড়ার সময়ে খুলি ফেটে যায়নি তো? চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে খুলি পরখ করলেন সুরেশ সাইকিয়া। চোটের চিহ্ন নেই। খুলি অক্ষত।

উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বেকারিতে চলুন। দল বেঁধে। এখানে কারও থাকার দরকার নেই।'

আহার্য-নিবাসে ঢুকল সবাই সামনের দরজা দিয়ে—পৌঁছোল পেছনের রান্নাঘরে। একতাল ময়দার ওপর বেলুন ধরে রয়েছে শুধু দুটো হাত—কব্জি পর্যন্ত। উনুনের

মধ্যে রয়েছে শুধু দুটো মুণ্ডু। রক্ত নেই কোত্থাও। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সবাই। অস্ফুটকণ্ঠে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'কশাই-ও এভাবে জবাই করতে পারে না। বডিগুলো গেল কোথায়?'

শুরু হল খোঁজা। কাবার্ডে, ড্রয়ারে, বাথরুমে, ফ্রিজে। কোথাও পাওয়া গেল না রজনী আর মনোরমা শিকদারের শরীরের বাদবাকি অংশ। বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'ডক্টর লাহা, চলুন সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতন জায়গাটায়—যেখানে ভয় পেয়েছিলেন।'

পুরো দলটাই বেরিয়ে এল বাইরে। কেউ আর কাউকে ছেড়ে থাকতে চাইছে



না। উৎকট এই দৃশ্য শিহরিত করেছে প্রত্যেককেই।

বাড়ির বাইরে সেই কাঠের গেট, ওপাশে একটা দোকান। মাঝে আলোহীন গলিপথ।

গেট খুলে ফেললেন সুরেশ সাইকিয়া। এখন তাঁর এক হাতে টর্চলাইট, আর এক হাতে রিভলভার।

ফিসফিস করে মাধবী বললে পেছন থেকে, 'পরি বলছিল, কে যেন ওঁত পেতে রয়েছে দেওয়াল ঘেঁষে। আমার মনে হয়েছিল, তারা রয়েছে মাথার ওপরে মাচায়।'

কাঠের গেট খোলার ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ নিস্তব্ধ গলিপথে প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল। তা মিলিয়ে যেতেই জাগ্রত হল সুরেশ সাইকিয়ার বুটজুতোর শব্দ। অকুতোভয় পদক্ষেপে প্রবেশ করছেন অন্ধকার বিবরে। টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে গলিপথের মাঝ পর্যন্ত। আলো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে পাশের দেওয়াল আর মাথার মাচার ওপর দিয়ে। কংক্রিটের দেওয়ালে পোকামাকড় পর্যন্ত নেই।

রিভলভার তুলে ধরার দরকার ছিল না—গলিপথের মাঝবরাবর গিয়ে ভেবেছিলেন সুরেশ সাইকিয়া। আর ঠিক তখনই তাঁর শিরদাঁড়া শিরশির করে উঠল। স্পষ্ট মনে হল, তিনি আর একা নন।

দাঁড়িয়ে গেলেন সেইখানেই। টর্চ ঘুরিয়ে ফের খুঁটিয়ে দেখলেন দেওয়াল আর সিলিং। পা টিপে টিপে হয়তো কেউ এসেছে পেছনে। কিন্তু কেউ নেই। গলিপথের সামনে আর পেছনে শুধু অন্ধকার চমকে চমকে উঠছে আলোর ঝলকানিতে। আর চমকে উঠছেন তিনি নিজে। কেউ নেই, অথচ মনে হচ্ছে, কে যেন তাঁকে দেখছে। বৈরীচোখে নজরে রেখেছে।

টর্চের আলোয় কী যেন চকচক করে উঠল মেঝেতে। পলকের জন্যে। মেঝের এই জায়গায় রয়েছে একটা ড্রেনের ঝাঁঝরি। লম্বায়-চওড়ায় ফুটখানেক। এগিয়ে গিয়ে টর্চ ফোকাস করলেন ভেতরে। দেড়ফুট ব্যাসের একটা ড্রেনপাইপ নেমে গেছে নিচে, জল নেই। শুকনো। চকচকে জিনিসটা তাহলে জল নয়।

ইঁদুর? শিবালয় শহরে পোকামাকড় ইঁদুর-ছুঁচো দমন করা হয় কঠোর হাতে। এ শহর বড়লোকদের শহর। দু-একটা ইঁদুর হয়তো থেকে গেছে।

নিশ্চিত হয়ে গলির শেষ পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। ফিরেও এলেন।

'কী দেখলেন?' বিশু বোসের প্রশ্ন।

গেট টেনে বন্ধ করে দিয়ে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে সুরেশ সাইকিয়া বললেন, 'চকচকে কী যেন দেখলাম ড্রেনের মধ্যে। আর মনে হল, কারা যেন দেখছে আমাকে—অথচ কেউ নেই।'

'শিকদার-ফ্যামিলিকে যারা কেটেছে তারা নিশ্চয় ড্রেনের বাসিন্দা নয়।'

‘তা তো বটেই। এবার চলুন ব্যারিকেড দেওয়া ঘরে।’

জোড়া খুনের বাড়ি যে রাস্তায়, সেই রাস্তায় ঢোকবার আগে থমকে দাঁড়ালেন সুরেশ সাইকিয়া। বললেন, ‘ও বাড়িতে ঢোকার আগে আগের বাড়িগুলো দেখতে যাব। একসঙ্গে নয়—দুটো দল হয়ে। রাস্তার একপাশ ধরে এগোব। পাশাপাশি দুটো বাড়িতে ঢুকবে দুটো দল। কেউ কারও কাছ থেকে বেশি তফাতে যাবে না, চোখের আড়াল হবে না—কক্ষনো নয়। যদি কিছু ঘটে, যদি কিছু দেখা যায়, দু-তিনবার ফায়ার করলেই পাশের বাড়ি থেকে সেই আওয়াজ শোনা যাবে, তখন দৌড়ে যাওয়া যাবে। প্রথম দলে থাকব আমি, বিশু বোস, ডক্টর লাহা, আর তুমি—পরি। দ্বিতীয় দলে লিডার হবেন উজাগর সিং। মেক ইট এ পয়েন্ট—দলছাড়া হবেন না, কোনও অবস্থাতেই নয়।’

মাধবী বললে, ‘নতুন ডেডবডি যদি দেখা যায়, কাইন্ডলি লক্ষ করবেন—চোখ কান নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে কি না।’

বিশু বোস বললেন, ‘রোগে মরলে যা হয়? কিন্তু কোনও রোগেই মুণ্ড বা হাত কাটতে পারে না।’

‘রোগ যখন মানুষকে উন্মাদ করে দেয় তখন সেই উন্মাদ অনেক কিছুই করতে পারে। যেমন, সাইকোপ্যাথিক কিলার। যেমন, র‍্যাবিড-ম্যানিয়াক।’

‘কোথায় সেই উন্মাদরা?’

‘লুকিয়ে আছে,’ বললে রমেশ থাপা।

খুনে পাগলরা মুখ বুজে ঘাপটি মেরে থাকে কি? এতক্ষণ ধরে?’

মাধবী বললে, ‘আমিও তাই বলি। পাগল নয়—অন্য কিছু। যা ভাবা যায় না।’

শুরু হল অভিযান।

প্রথম বাড়িটা রোগাটে ধরনের। পেছনদিকে লম্বাটে। এ বাড়ির একতলায় রয়েছে ছবি আর গিফট-এর দোকান। সামনের দরজার কাচ ভেঙে ভেতরে হাত ঢোকালেন উজাগর সিং, লক খুলে দরজা ঠেলে ঢুকে গেলেন। সুইচ টিপে আলো জ্বাললেন। দলের সবাইকে বললেন, ‘গায়ে গা লাগিয়ে থেকো না, ছড়িয়ে পড়ো। জোট বেঁধে থাকলে শত্রুর সুবিধে—সোজা টার্গেট। এক মারেই খতম করে দেবে।’

‘উজাগর সিংকে একসময়ে টেররিস্ট এলাকায় অপারেশন করতে হয়েছিল, গেরিলা অ্যাকটিভিটির মোকাবিলা করতে তিনি জানেন। আর্মি ট্রেনিং ভোলা যায় না।

দু'পাশের গ্যালারিতে ছবি আর গিফট সাজানো। লোকজন কেউ নেই। গ্যালারির শেষে ছোট্ট অফিসঘর। সেখানেও কেউ নেই। এই ঘরের পেছনে একটা দরজা। দরজা খুললেই সামনে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। মিলিটারি কায়দায় সিঁড়ি ভাঙলেন উজাগর সিং, এক হাতে রিভলভার। ওপরের চাতালে উঠে সুইচ টিপে আলো জ্বালালেন। সামনেই মালিকের ফ্ল্যাটের বসবার ঘর। ঘর ফাঁকা। নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ইঙ্গিতে দলবলকে বললেন উঠে আসতে। নিজে সন্তর্পণে ঢুকলেন ঘরে। দাঁড়ালেন দেওয়াল ঘেঁষে। চোখে বিদ্যুতের ঝলক, সতর্ক শরীরের প্রতিটি অণুপরমাণু।

তন্ন তন্ন করে দেখা হল ফ্ল্যাটের খাবার ঘর। কেউ নেই। রান্নাঘরে রয়েছে একটা মৃতদেহ। ফ্রিজ খুলে রেখে হেলে রয়েছে ফ্রিজের গায়ে। ফোলা শরীর। নীলচে-কালচে চামড়া। চোখে বিস্ময় বা আতঙ্ক নেই। মরেছে খুব তাড়াতাড়ি। ফ্রিজ খুলেছিল টম্যাটো চীজ আর সালামি দিয়ে স্যান্ডউইচ বানাবে বলে। তিনটে জিনিসই ছড়িয়ে পায়ের কাছে।

'রোগ নয়। হলে, স্যান্ডউইচ খাওয়ার ইচ্ছে হত না,' আস্তে বললেন উজাগর সিং।

'মরেছেও আচমকা,' রমেশ থাপার মন্তব্য, 'হাতভরতি খাবারদাবার নিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়েই খতম।'

শোবার ঘরে পাওয়া গেল আরও একটা ডেডবডি। একটি ছেলে। শুয়ে রয়েছে খাটে। শরীর জুড়ে অত কালসিটে থাকলে সঠিক বয়স ঠাহর করা যায় না। মুখ জুড়ে আতঙ্ক—যেমনটা দেখা গেছিল সুমন্ত সেনের মুখে। ভয়ানক ভয়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে গেছিল, মাঝপথেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে।

দলাই-মলাই করা চাদরে পড়ে একটা পয়েন্ট টু-টু অটোমেটিক। পকেট থেকে কলম বের করলেন উজাগর সিং। ট্রিগার গার্ডে ঢুকিয়ে তুলে নিলেন। ক্লিপ খুললেন। গুলি নেই ভেতরে। বেডল্যাম্পের দিকে নল ঘুরিয়ে এক চোখে তাকালেন ভেতরে। চেম্বারে নেই গুলি। নাকে ঠেকিয়ে শুঁকলেন। বারুদ পোড়ার গন্ধ পেলেন।

বললেন, 'গুলি ছোঁড়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ফায়ারিং যখন শুরু হয়েছিল, ধরে নেওয়া যাক, ক্লিপ তখন ভরতি ছিল। মোট দশ রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে। ওই তো একটা বুলেট হোল।'

গুলির গর্তটা রয়েছে খাটের মাথার দিকে দেওয়ালের গায়ে। মেঝে থেকে প্রায় সাত ফুট হাইটে।

পাওয়া গেল আরও একটা বুলেট হোল। দেওয়ালে বসানো কাঠের মূর্তি ফাটিয়ে চৌচির করে ঢুকে গেছে ভেতরে। দশটা ফাঁপা খোল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে

মেঝেতে। কিন্তু পাওয়া গেল না বাকি আটটা বুলেটের গর্ত। বোঝা গেল না, সে গুলি লেগেছে কোথায় আর গেলই বা কোথায়।

আটটা গুলিই কি তাহলে লেগেছে আততায়ীর গায়ে? আটবার গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মরে পড়ে নেই কেন? তা ছাড়া, একজনের গায়ে আটখানা বুলেট ঢুকিয়ে দেওয়া কি সম্ভব? শুয়ে শুয়ে?

অসম্ভব।

তা ছাড়া, রক্তই বা কোথায়? আটখানা বুলেট হজম করে কিছুটা রক্তপাত ঘটানো উচিত ছিল গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির। কিন্তু তা হয়নি।

খাটের পায়ের কাছে গিয়ে ছেলেটার দিকে চেয়ে রইলেন উজাগর সিং। দুটো মাথার বালিশ পিঠে দিয়ে আধবসা অবস্থায় দু'পা ছড়িয়ে রয়েছে সামনে।

রান্নাঘরের নিহত মানুষটা বোধহয় এই ছেলের বাবা। ছেলের জন্যে খাবার আনতে গেছিল। তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে ঠিক সেই সময়ে। নিমেষে মারে পিতাকে। তাকে সময় দেননি। সময় দিয়েছে ছেলেটাকে—বুলেট বর্ষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।

আর্ট গ্যালারির পাশের দোকানটায় ম্যাগাজিন, টোব্যাকো আর বইয়ের দোকান। আলো জ্বলছে ভেতরে, দরজা রয়েছে খোলা। বইয়ের দোকানের দরজা রোববারেও খোলা থাকে।

সুরেশ সাইকিয়া আগে ঢুকলেন, তাঁর পেছনে মাধবী আর পরি, একদম পেছনে বিশু বোস।

জনপ্রাণী নেই দোকানঘরে, নেই অফিসঘরে, নেই ওপরতলায়। শুধু জল থইথই করছে মেঝেতে। অথচ পাইপ ফুটো হয়নি। কুলার থেকে জল উপচে বেরিয়ে আসেনি।

নির্নিমেষে এই জলের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বেরিয়ে এলেন সুরেশ সাইকিয়া। জলটা তাঁর ভালো লাগেনি।

জল দেখা গেল পাশের বাড়িতেও। ও বাড়ির একতলায় ওষুধের দোকান। ওপরের তলায় মালিকের ফ্ল্যাটে। বসবার ঘরের কার্পেটে ফুলে উঠেছে জলে। অথচ জল এসেছে কোত্থেকে, তা ধরতে পারছেন না উজাগর সিং।

এর পাশেই ছোট্ট হোটেলে দেখা গেল অন্য দৃশ্য।

তিনতলা বাড়ি খাঁ-খাঁ করছে। একতলায় বসবার ঘর, কাউন্টার ফাঁকা। দোতলায় মালিকের ফ্ল্যাট ফাঁকা। তিনতলায় ছ'টা ঘরই ফাঁকা। অথচ সেখানে অতিথি ছিল। তাদের থাকার চিহ্ন ছড়ানো রয়েছে ঘরময়। নেই কেবল মানুষগুলো।

ষষ্ঠ ঘরের বাথরুমের দরজা বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। ল্যাচ লাগানো দরজা—লক টানতে হয় ভেতর থেকে। নিশ্চয় মানুষ, আছে ভেতরে।

হেঁকে বলেছিলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'পুলিশ। দরজা খুলুন।'

সাড়া নেই।

ধাক্কা দিলেন।

সাড়া নেই।

রিভলভারের এক গুলিতে লক উড়িয়ে দিলেন।

কলতলা ফাঁকা।

জানলা নেই। সুতরাং কলতলায় যে ঢুকেছিল, সে ঘরেই আছে। তবে উবে গেছে। শুধু একটা নিশানা রেখে গেছে বেসিনের ওপকার আয়নায়। আঠালো কালি দিয়ে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা রয়েছে: ***আদিম শত্রু। উতঙ্ক চৌধুরী।***

বিশু বোস আর সুরেশ সাইকিয়ার মাঝে দাঁড়িয়ে মাধবী আর পরি যখন লেখাটা পড়ছে, ঠিক তখন পাশের দোকানে আবার রহস্যময় জলের ওপর দাঁড়িয়ে পড়েছেন উজাগর সিং...

শুধু জল। মেঝে ভরতি জল। পাইপ ছেঁদা নেই, অথচ জল জমে রয়েছে মেঝেতে।

মালিকের কিচেনে ঢুকে একটা প্লাস্টিকের খালি শিশি পেলেন উজাগর সিং। আর একটা চামচে। জল তুলে ভরলেন শিশিতে।

স্যাম্পেল সংগ্রহ করলেন। খটকা যখন লেগেছে, কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করাবেন।

এ জল সাধারণ জল নয়।

চোখের পাতা নামাতে পারছে না মাধবী। চক্ষুগোলক ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটর থেকে।

পরি বললে শুকনো গলায়, 'দিদি, উতঙ্ক চৌধুরী কে?'

'যে লিখেছে,' বিশু বোস জবাব দিলেন।

'এ ঘর যে ভাড়া নিয়েছিল?' সুরেশ সাইকিয়ার প্রশ্ন।

'রেজিস্টার দেখে এসেছি আসবার সময়ে,' বললেন বিশু বোস, 'এ নাম পাইনি। নেমে গিয়ে ফের দেখব।'

পরি বললে, 'খুনীদের একজনের নামও তো হতে পারে? ঘরে যে ছিল, সে চিনতে পেরেছিল। তাই নামটা লিখে রেখেছে।'

মাথা নাড়লেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘খুনী কখনও নিজের নাম রেখে যায়? খুন করার পর নাম মুছে দিয়ে যেত।’

‘হয়তো জানত না এ নাম লেখা আছে আয়নায়। জানলে তো মুছবে,’ পরির গলায় আশ্চর্য জোর এসেছে।

‘অথবা হয়তো জানত, জেনেও মোছেনি। রোগ-জীবাণু যখন মানুষকে পাগল করে দেয়, তখন সূত্র পড়ে রইল কি রইল না এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না,’ আস্তে বললেন বিশু বোস। ‘তোমার দিদি কিন্তু বলেছেন, র‍্যাবিড ম্যানিয়াকদের হাত থাকতে পারে শহরজোড়া এই খুনখারাপিতে।’

‘উতঙ্ক চৌধুরী নামে কেউ আছে শিবালয় টাউনে?’ মাধবীকে সুরেশ সাইকিয়ার প্রশ্ন।

‘অদ্ভুত নাম। একবার শুনলে মনে থাকত।’

‘এ টাউনের সবাইকে আপনি চেনেন?’

‘নিশ্চয়।’

‘পাঁচশো জনকেই?’

‘প্রায়।’

‘তাহলে জনাকয়েককে এখনও চেনেন না। উতঙ্ক চৌধুরী এই জনাকয়েকের মধ্যে তো থাকতে পারে?’

‘চোখের দেখা না দেখলেও নাম নিশ্চয় শুনতাম। ছোট্ট শহর। পাড়াপড়শির গল্পগুজব আমার সামনেই হয় বিশেষ করে, এই নামের কেউ থাকলে তাকে নিয়ে জমিয়ে হাসিঠাট্টা হত নিশ্চয়। না, না, এ নামে এ টাউনে কেউ নেই।’

‘আশপাশের কোনও অঞ্চলের মানুষ কি? তারাও তো আসে আপনার কাছে?’

চুপ করে রইল মাধবী। কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। শুধু ভাবতে চাইছে। লেখাটা নিয়ে ভাবনা এখানে আটকে যাচ্ছে, ফাঁকা কোথাও গেলে হত। এই ঘরের পরিবেশ সহ্য হচ্ছে না। গা শিরশির করছে। মন বলছে—পালাও! পালাও! মাধবী লাহা, এই বাড়িরই আর এক জায়গায় তোমাদের জন্য তৈরি হচ্ছে আর এক আতঙ্ক!

পরি চেয়েই ছিল আয়নার দিকে। এখন বললে, ‘আদিম শত্রু কে?’

‘উতঙ্ক চৌধুরী—আবার কে? লিখেই তা জানাতে চেয়েছে লেখক,’ বললেন বিশু বোস।

‘লিখেছে তো গোঁফ কালো করবার পেন্সিল দিয়ে। কোথায় সেই পেন্সিল?’ জিজ্ঞেস করলেন সুরেশ সাইকিয়া।

পাওয়া গেল না বাথরুমের কোত্থাও।

এখন ওরা নিচের তলায়। গেস্ট রেজিস্টারে নাম পাওয়া গেল ভদ্রলোকের—বিনয় চৌধুরী, কলকাতা।

কলতলায় ঢুকে যিনি ভ্যানিশ হয়ে গেছেন! সঙ্গে নিয়ে গেছেন শুধু গোঁফ কালো করার পেন্সিল।

রেজিস্টারের অন্য নামগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন বিশু বোস—'উতঙ্ক চৌধুরী নামে কেউ এখানে থাকেননি।'

'তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক,' বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'দেখা যাক কী পেলেন উজাগর সিং।'

গলিপথ ধরে দরজার দিকে যাওয়ার পথে সামনে পড়ল একটা টেবিল। সিলিং থেকে আলো ঝুলছে তার ওপর। পরিকে টেনে নিয়ে সবার আগে ওইদিকেই পা চালিয়েছিল মাধবী—এ-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতলবে। আচমকা চিৎকারটা বেরিয়ে এল ওরই গলা চিরে।

একই সঙ্গে প্রত্যেকে দেখল সেই দৃশ্য।

আলোর নিচে যেন একটা শিল্পসামগ্রী বসানো রয়েছে টেবিলের ওপর। কব্জি থেকে কাটা একটা হাত। বুড়ো আঙুল, তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে ধরে রয়েছে একটা পেন্সিল—গোঁফ কালো করার পেন্সিল।

যে পেন্সিল পাওয়া যায়নি কলতলায়।

কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বিশু বোস বললেন, 'এখান দিয়ে যাবার সময়ে টেবিলে কিছু ছিল কি?'

'না,' সুরেশ সাইকিয়ার প্রশান্ত জবাব, 'নিচে নেমে আসছি যখন, তখন এনে রাখা হয়েছে আমাদের দেখানোর জন্যে।'

উনি স্তব্ধ হতেই ওপরতলা থেকে ভেসে এল একটা আওয়াজ—ক্যাঁচ... ক্যাঁচ।

পাল্লা ঘোরানো হচ্ছে, খোলা হচ্ছে, ফের বন্ধ হচ্ছে... আবার... আবার...

আপনা থেকে নিশ্চয় হচ্ছে না। কেননা, হাওয়া তো নেই।

মাধবীর দিকে ফিরলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'মন্দিরের ঘণ্টা আর সাইরেনের আওয়াজ যখন শুনেছিলেন, তখন কি আপনার মনে হয়েছিল ঘটনা আবার ঘটবে, আমরা এলে?'

'হয়েছিল।'

'ইওর প্রিমনিশন ইজ কারেক্ট, ডক্টর লাহা। ঘটনা আবার ঘটতে চলেছে।'

রমেশ থাপার মেজাজ খিঁচড়েছে। সে এখন দাঁড়িয়ে আছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্স-এর সামনে। তার একপাশে উজাগর সিং, আর একপাশে শচীন আর সুধাকর।

চারজনেই চেয়ে আছে রাস্তার উলটোদিকের ছোট্ট হোটেলটার দিকে। দরজা দিয়ে এইমাত্র বেরিয়ে এলেন সুরেশ সাইকিয়া আর বিশু বোস। মাধবী আর পরি তাঁদের পেছনে। চারজনেরই হাঁটতে যেন কষ্ট হচ্ছে।

উজাগর সিং অর্ডার দিয়েছেন একই সঙ্গে ঢোকা হবে এই দোকানটায়। গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। ভয়ানক কিছু ঘটেছে দোকানঘরে। নইলে সামনের শোকেসের পেল্লায় কাচ দু'খানা বাইরে ঠিকরে এসে ফুটপাতের ওপর ভেঙে পড়বে কেন?

উজাগর তাই প্ল্যান করেছেন, দল ভারী করে ঢুকতে হবে ভেতরে। অনেক অভিজ্ঞতাই তো হল, সৃষ্টিছাড়া অনেক কিছুই দেখা হল।

এসে গেছেন সুরেশ সাইকিয়া। প্লাস্টিক শিশিতে আনা অদ্ভুত জলের নমুনা তাঁকে দেখাচ্ছেন উজাগর সিং। সুরেশ সাইকিয়া বলছেন, এমনই জলের সাক্ষাৎ তিনিও পেয়েছেন। দু-জনেই চেয়ে আছেন শোকেসের ভাঙা কাচের দিকে। কী এমন ঘটল দোকানের ভেতরে যে দু-দু'খানা কাচ ভেঙে পড়ল বাইরের দিকে? ভেতরে ঢোকার ফন্দি আঁটছেন খাটো গলায়।

এই হ্যাপায় ঢোকবার কোনও ইচ্ছেই নেই রমেশ থাপার। পুলিশের চাকরি বড় ঝঞ্ঝাটের। দোকানের ভেতরে নিশ্চয় নারকীয় কিছু ঘটেছে। বড় দোকান। শোকেসে যা কিছু সাজানো ছিল, ভাঙা কাচের ওপর সেসবও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ফুটপাতে। কাচ যে অথবা যারা ভেঙেছে, তারা নিশ্চয় ওঁত পেতে বসে রয়েছে ভেতরেই। রমেশ ঠিক করল, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা!

মতলব স্থির হয়ে গেছে সুরেশ সাইকিয়ার। লাইন দিয়ে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন দোকানের দরজার দিকে। রমেশ রইল সবার পেছনে।

তছনছ হয়ে রয়েছে মনোহারী দোকান। তাকভরতি সমস্ত জিনিস ঝটকান মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে মেঝেতে। বিষম আক্রোশে যেন তাথৈ তাথৈ নৃত্য চলেছে ঘর জুড়ে। ভারী জিনিস শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলা রয়েছে—আস্ত কাচ কোত্থাও নেই।

দোকানের পেছনদিকে শুধু বস্তা আর বাক্স। প্রত্যেকটা বস্তা ছিঁড়ে ফালা ফালা করা, বাক্সগুলো ভেঙে ফুটিফাটা—ভেতরের সব জিনিস বাইরে ছড়ানো।

সুরেশ সাইকিয়া বললেন, 'এবার স্টোররুমটা দেখা যাক।'

আলো নিভে গেল ঠিক তখুনি।

রাস্তার আলোও নিভে গেছে—তাই সামনের জানলা দিয়ে আসছে না আলো। স্টোররুমের সামনে নিচ্ছিদ্র তমিস্রা ওদের গিলে ফেলেছে...

একই সঙ্গে শোনা গেল অনেকগুলো গলা।

'টর্চ।'

'দিদি!'

'টর্চ কোথায়?'

তারপরেই খুব দ্রুত ঘটে গেল পর-পর কয়েকটা ঘটনা।

টর্চ জ্বলে উঠল বিশু বোসের হাতে। বর্শাফলকের মতন আলো ধেয়ে গেল মেঝের ওপর দিয়ে। কে যেন তাঁকে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল পেছন থেকে। সেই মুহূর্তে তাঁর পেছনে কারও থাকার কথা নয়। থাকলেও সে ছিল অদৃশ্য অবস্থায়। তার গতিবেগও অবিশ্বাস্য। বিশু বোসকে আছড়ে ফেলল শচীনের ওপর, শচীন তাঁকে নিয়েই ঠিকরে পড়ল সুধাকরের ওপর। তিন জনেরই দেহ একই সঙ্গে গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর —সেই সঙ্গে বোতাম টিপে রাখা জ্বলন্ত টর্চবাতি। গড়াতে গড়াতে আলোর ঝলক ফেলে যাচ্ছে এলামেলোভাবে।

গড়ানে বিদ্যুৎ-মশালকে মেঝে থেকে তুলে নিতে গিয়েও পারলেন না সুরেশ সাইকিয়া।

ইতিমধ্যেই শূন্যে উঠে পড়েছে রমেশ থাপার শরীর। যে অদৃশ্য শক্তি তিন-তিনটে মনুষ্যদেহকে হেলায় ঠিকরে দিয়েছে মেঝের ওপর, সেই শক্তিই আচমকা রমেশের কাঁধ খামচে তাকে তুলে নিয়েছে শূন্যে।

রমেশের পা এখন মেঝেতে ঠেকছে না। তার কাঁধে অতি-শীতল বস্তুর ছোঁয়া, একটু ভিজে ভিজে। বস্তু বলে মনে হলেও তা সজীব...

শূন্যে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে কোমরের টর্চের দিকে হাত বাড়িয়েছিল রমেশ।

পাইথনের পাক যেন চেপে বসল গলা ঘিরে। দম আটকে এল রমেশের। টর্চ টেনে আনার কথা আর মনে রইল না। দু'হাত তুলে অদৃশ্য নাগপাশকে খামচে ধরতে যেতেই...

দু'হাতকে জাপটে ধরে অবশ করে দিল আততায়ী। হিমশীতল আলিঙ্গন—বাহু, ধড় সবকিছুর ওপর দিয়ে।

শিশুর মতন কেউ তাকে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শূন্যপথে। গলা ফাটিয়ে চেঁচানোর চেষ্টা করেছিল রমেশ... মুখের ওপর চেপে বসেছিল থাবা। থাবা ছাড়া তাকে আর কিছু মনে করতে পারেনি রমেশ। মুখ ঠুসে ধরায় কোনও আওয়াজ আর বেরোয়নি।

নাকে ভেসে এসেছিল দুর্গন্ধ। খুব উৎকট নয়, কিন্তু অসহ্য। এরকম বদ গন্ধ রমেশকে জীবনে শুঁকতে হয়নি।

গোটা শরীরে পাক দিচ্ছে। বমি ঠেলে উঠে আসতে চাইছে। অবিশ্বাস্য এক দুঃস্বপ্ন রমেশকে পেঁচিয়ে ধরে নিয়ে চলেছে কল্পনাতীত পরিণতির দিকে। রমেশ বুঝেও কিছু করতে পারছে না...

টর্চ লাইট গড়িয়ে গিয়ে ধাক্কা খেতেই কাচ আর বাল্ব ভেঙে গেল। এখন এখানে নরকের একাকার।

সঙ্গীদের হাঁকডাক শুনতে পাচ্ছে রমেশ কিন্তু যেন বহুদূর থেকে!

রমেশ থাপাকে আর পাওয়া গেল না।

নিভে যাওয়া টর্চলাইট কুড়িয়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ দপ করে জ্বলে উঠেছিল মনোহারী দোকানের সমস্ত আলো। খুব জোর পনেরো থেকে বিশ সেকেন্ডের মতন অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল সবাইকে। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে গেছে রমেশ। আলো জ্বলবার পর দেখা গেল শুধু সে নেই—সবাই আছে।

খোঁজা হয়েছিল সব জায়গাতেই। পাওয়া যায়নি। রাস্তাতেও নেই রমেশ, নেই ফুটপাতে। শিবালয় শহর যেন নিঃশব্দে বিদ্রুপের হাসি হেসে চলেছে।

'গেল কোথায়?' প্রশ্নটা উজাগর সিং-এর।

'নিজে যায়নি, নিয়ে গেছে,' সুরেশ সাইকিয়ার জবাব।

চেঁচাল না কেন?'

'চান্স পায়নি বলে।'

'জ্যান্ত অবস্থায়, না, মরা অবস্থায়?' পরি আর মুখ বুজে থাকতে পারল না।

'মরে কাঠ না হলে রমেশকে নিয়ে যাওয়া যেত না,' দাড়ির জঙ্গল চুলকোলেন উজাগর, 'ডেডবডি দেখতে পাব শীগগিরই।'

এই কথার জবাবেই যেন সহসা জ্বলে উঠল রাস্তার সমস্ত আলো। হঠাৎ বেড়ে গেল হাওয়ার বেগ—ভেসে এল গাছের পাতাদের নড়াচড়ার আওয়াজ। নুয়ে পড়েছে ডালপালা, দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে রাস্তার ওপর দিয়ে হু হু করে...

উজাগর বললেন, 'রমেশের ডেডবডি যদি দেখতে পেতাম—'

কথা শেষ হল না, বেজে উঠল মন্দিরের ঘণ্টা। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে শিবমন্দির। রাস্তার মোড়ে। চুড়োয় মস্ত পিতলের ঘণ্টা। ঘণ্টা দুলছে রাস্তার—আলো ঝিলিক তুলে ঠিকরে যাচ্ছে তার পেতলের বপু থেকে। ঘণ্টা নাড়ানো হচ্ছে নিচ থেকে। দড়ি ধরে কেউ টানছে... ঘণ্টা নড়ছে... বাজছে...

'কে টানছে?' পরি হাত চেপে ধরল দিদির।

'উজগর সিং যার ডেডবডি দেখতে চেয়েছিলেন, হয়তো সে,' ফিসফিস করে বললে মাধবী।

কথাটা শুনল সবাই। কিন্তু হাসতে পারল না কেউই। সবারই মনের চোখে যুগপৎ ভেসে উঠল একটা শবদেহের ছবি। ফুলে ঢোল হয়ে ওঠা, নীলচে-কালচে রঙের একটা শবদেহ মন্দিরের ঘণ্টা ঘরের তলায় দাঁড়িয়ে দু'হাতে দড়ি ধরে টানছে...

টানছে... টানছে...। ঘণ্টাধ্বনির সম্মোহনী শক্তি একটু করে সবাইকে আচ্ছন্ন করে আনছে। যেন টানছে সব্বাইকে। পা চুলবুল করছে মন্দিরের দিকে যাওয়ার জন্যে... মনের শক্তি লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে।

দাঁতে দাঁত পিষে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'ডাকছে, আমাদের ডাকছে।' উনি নিজের মনোবল জাগ্রত করছেন—ইচ্ছাশক্তিকে লোপ পেতে দিচ্ছেন না।

আচ্ছন্নের সুরে বলে গেলেন উজাগর, 'হ্যাঁ, আমাদের ডাকছে...।'

উসখুস করছে আর সকলেই। যেন মন্ত্র-অবশ অঙ্গ প্রত্যেকেরই।

'যাবেন না,' ক্ষীণ কণ্ঠে বললে মাধবী।

সুরেশ সাইকিয়া শক্ত করে নিয়েছেন নিজেকে, 'রাইট। এখান থেকে গিয়ে রমেশ থাপা-ই যদি ঘণ্টা বাজায়—'

'উদ্ভট চিন্তা,' আধবোজা চোখে বিড় বিড় করে গেলেন উজাগর সিং।

কঠোর কণ্ঠ সুরেশ সাইকিয়ার, 'যেই বাজাক, আর একটা লোককেও বলি দিতে রাজি নই। আসুক নতুন ফোর্স, তখন দেখব কে বাজাচ্ছে ঘণ্টা। তার আগে চলুন থানায়। মার্চ।'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল ঘণ্টাধ্বনি। উজাগরের কথায় সায় দিয়ে যে প্রবল উৎসাহে ঘণ্টা বাজাচ্ছিল, সুরেশ সাইকিয়ার সিদ্ধান্তে হতাশ হয়ে সে যেন ঘণ্টার দড়ি ছেড়ে দিল। শব্দের শেষ ঢেউটা কাঁপতে কাঁপতে দূর হতে দূরে মিলিয়ে গেল একসময়ে। আবার দম আটকানো নীরবতা।

জুতোর আওয়াজে নৈঃশব্দ্য ভাঙতে ভাঙতে ওরা এগিয়ে গেল থানার দিকে। বড় রাস্তা ছেড়ে নামল না গলিতে। শর্টকাটের আর দরকার নেই, দরকার শুধু জোরালো আলোর।

জুতোর শব্দ এসে থামল থানার সামনে। আগে ঢুকলেন সুরেশ সাইকিয়া। সবশেষে উজাগর সিং।

চেয়ে রইলেন সবাই মেঝের দিকে। সুমন্ত সেনের দেহ কিছুক্ষণ আগেও এখানে পড়েছিল। এখন নেই। জায়গাটা খালি।



সুমন্ত সেনের টেবিলে বসে আছেন সুরেশ সাইকিয়া। যুদ্ধকালীন আয়োজন চলছে তাকে ঘিরে। ছোট্ট দলের প্রত্যেককে কাজ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সুমন্তর ম্যাগাজিন সরিয়ে সেখানে বড় কাগজ পেতেছেন তিনি। টুকটাক পয়েন্ট, কেস হিস্ট্রি আর অ্যাকশন প্রোগ্রাম লিখছেন।

এবার টেনে নিলেন টেলিফোন, তুললেন রিসিভার। এসে গেল ডায়াল টোন। মাধবী লাহার মতন বেগ পেতে হল না।

ডায়াল করলেন এমার্জেন্সি নাম্বার—টিকেন্দ্রনগর হেডকোয়ার্টারে। জবাব দিল ডিউটি সার্জেন্ট অ্যান্টনি, 'ইয়েস, স্যার?'

সংক্ষেপে ঘটনাবলীর সারাংশ বলে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া।

'রমেশ তাহলে খতম?'

'সেটা বলা যাবে না যতক্ষণ না ডেডবডি দেখছি। এবার কাজের কথা। প্রথমেই একটা পাসওয়ার্ড তৈরি থাকা দরকার। শিবসুন্দর—এই পাসওয়ার্ড না শোনা পর্যন্ত মুখ খুলবে না কারও কাছে। শিবালয় টাউন থেকে কোনও খবর যেন বাইরে না যায়, বাইরের খবর যেন এখানে না আসে। পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে শিবালয়কে।'

'হয়ে যাবে। শিবালয় শহরে ফ্যাক্স মেশিন নেই, আমি জানি। টেলিফোন কাট-অফ করে দেব।'

'তা সত্ত্বেও, খবরটা ছড়িয়ে যাওয়ার পর পাহাড় টপকে রিপোর্টার আসতে শুরু করবে। তাদের কাছে কোনও খবর যেন না যায়। রাইট?'

'ইয়েস, স্যার।'

'বারোজন লোক চাই। দু'জন থাকবে টাউনে ঢোকার মুখে। দশজন চলে আসবে আমার কাছে। এদের কারোরই যেন ঘরসংসার বলে কিছু না থাকে। প্রাণের মায়া অবশ্যই থাকবে না। শিবালয় শহরে যাদের আত্মীয়স্বজন আছে, সেরকম কাউকে নেবে না। দিন দুয়েকের মতন খাবার জল আর খাবার সঙ্গে আনবে প্রত্যেকেই। এই দু'দিন এখানকার জল বা খাবার তাদের দেওয়া যাবে না, ক্লিয়ার?'

'ইয়েস, স্যার?'

'বারোজনই নিজেদের সাইড আর্ম আনবে সঙ্গে, এ ছাড়াও একটা করে রায়ট গান আর টিয়ার গ্যাস।'

'নেক্সট?'

'শিবালয়ের ম্যাপ দেখলাম এখুনি। এ শহরের ঢোকবার পথ দুটো। একটা মেন রোড—সেখানে পাহারা বসিয়েছি। আর একটা রাস্তা পেছনের জঙ্গল দিয়ে নেমেছে। ডেসপারেট রিপোর্টাররা এদিক দিয়েও ঢুকতে পারে। দু'জনকে পাহারায় রাখব এখানে। ঠিক আছে? আমি জানি, তুমি এদিককার পাহাড়-পর্বতের খবর রাখো।'

'রাখি।'

'কর্নেল ডিসুজার নাম তুমি জানো। ঠিকানা ফাইলে পাবে। তাঁর সঙ্গে কথা বলার দরকার হতে পারে—ভিড় সামলানোর জন্যে। তৈরি থেকো।'

'এনিথিং মোর?'

'উতঙ্ক চৌধুরী নামটা লিখে রাখো। উ-ত-ঙ্ক চৌধুরী। কী তাঁর পরিচয়? পেশা? ঠিকানা? পুলিশ ফাইলে রেকর্ড আছে কি না, খোঁজ নেবে। কলকাতায় খোঁজ নেবে সবার আগে। বাঙালি নাম। আরও একটা নাম লেখো—বিনয় চৌধুরী। হোটেলের রেজিস্টারে নাম পেয়েছি। ডিটেলস জানো। আর একটা কথা। যে বারোজন আসবে, তাদের সঙ্গে দুশো পলিথিন ব্যাগ দিয়ে দেবে ডেডবডি রাখবার জন্যে।'

'দুশোটা?'

'পাঁচশোটাও লাগতে পারে। শিবালয়ে লোক থাকত পাঁচশো।'

'ও মাই গড!'

টেলিফোন নিয়ে সুরেশ সাইকিয়া যখন তন্ময়, তখন পুলিশ রেডিয়ো খুলে ফেলা হচ্ছে—রেডিয়ো বিগড়েছে কেন, তা জানার জন্যে। থানার সমস্ত আগ্নেয়াস্ত্র নামানো হচ্ছে আলমারি থেকে—গুলি ঠাসা হচ্ছে প্রত্যেকটাতে।

সুরেশ সাইকিয়া এবার ফোন করলেন গভর্নর হাউসে।

গভর্নর জ্যাক সাংঘুলানা আর পুলিশ প্রধান সুরেশ সাইকিয়া এক সময়ে একই ক্লাসে স্কুলে পড়েছিলেন। সেই বন্ধুত্ব আজও আছে। জ্যাক চলে গেছিলেন পলিটিক্সে। ধাপে ধাপে উঠে এসেছেন গভর্নরের পোস্টে। দিল্লি তাঁকে খাতির করে। কারণ অত্যন্ত সেন্সিটিভ এই পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁর হুকুমে বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়। পুরো জায়গাটা তাঁর নখদর্পণে।

জ্যাক সাংঘুলানাকে এত রাতে টেলিফোন করে পাওয়া যায় না। কিন্তু সুরেশ সাইকিয়া জানেন, কী করে তাঁর ঘুম ভাঙাতে হয়। এখানেও আছে 'চিচিং ফাঁক' পাসওয়ার্ড। নিতান্ত প্রয়োজন হলে সুরেশ ব্যবহার করেন এই গুপ্ত পরিচয়।

টেলিফোন ধরলেন গভর্নর। ঘুমজড়ানো গলায় বললেন, 'কী ঝামেলায় পড়েছিস?'

সুরেশ গুছিয়ে বললেন ঝামেলার বৃত্তান্ত।

জ্যাক বললেন, 'কী চাস?'

'টেলিফোন সেন্টার কাট-অফ করে দিক শিবালয় টাউনকে। খবরটা কাল ছড়িয়ে পড়লেই ঘরে ঘরে টেলিফোন যেন না বাজে। বাজুক শুধু এইখানে—থানায়।'

'তাই হবে। আর?'

'হেলথ ডিপার্টমেন্ট যেন নাক না গলায়। জীবাণু সংক্রমণ না পরিবেশ দূষণ—এটা যখন জানা যায়নি তখন তাদের হল্লাবাজির দরকার নেই।'

'কিন্তু সুরেশ, গোটা টাউনের সমস্ত মানুষ যদি মরে যায় হঠাৎ, হেলথ ডিপার্টমেন্টকে তো আটকানো যায় না। যাকগে, তুই যখন বলছিস, তাই হবে। জার্মস না পয়জন—এটা আগে ঠিক কর।'

'দুটো জেনারেটর চাই। পাওয়ার কন্ট্রোল আমাদের হাতে নেই, যখন তখন লোডশেডিং হচ্ছে।'

'জেনারেটর সমেত ভ্যান পাঠাচ্ছি। আর্থকোয়েক রিসার্চ ডিপার্টমেন্টে খানকয়েক আছে বলে জানি। আর কী?'

'কর্নেল ডিসুজাকে দরকার।'

'কর্নেল ডিসুজা! কেন?'

'চমকে উঠলি? যদিও ব্যাপারটা খুব সিক্রেট তবুও আমি জানি কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার সংক্রান্ত একটা প্রোজেক্টের উনি কর্ণধার। এই পাহাড়ি অঞ্চলে গোপনে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন আর্মির হয়ে। যেহেতু তিনি রিটায়ার্ড, তাই সন্দেহ তাঁকে ছুঁতে পারছে না। কিন্তু আমি জানি, আমাকে জানতে হয়। ওঁকে আমার চাই। একমাত্র উনিই ধরতে পারবেন কেন কাটাছেঁড়া আর ফুলে ঢোল বডি পাওয়া

যাচ্ছে যেখানে-সেখানে, কী কারণেই বা অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে একটা মানুষ।’

ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন জ্যাক, ‘ওঁর এক্সপেরিমেন্টের নার্ভ গ্যাস অথবা পয়জন এই কাণ্ড ঘটিয়েছে বলে কি তোর মনে হচ্ছে?’

‘কর্নেল ডিসুজাই তা বলতে পারবেন। যেহেতু উনি এই প্রোজেক্টের সিভিলিয়ান ডিফেন্স ইউনিটের কম্যান্ডিং অফিসারও বটে, তাই তাঁর গোচরে আনা দরকার এখানকার পুরো ব্যাপারটা। ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যে উনি সায়ান্টিস্টদের এনে ফেলতে পারবেন শিবালয় টাউনে। বায়োলজিস্ট, ভাইরাস-এক্সপার্ট, ব্যাকটিরিয়োলজিস্ট, ফোরেনসিক মেডিসিনে এক্সপার্ট প্যাথোলজিস্ট, নিউরোলজিস্ট, এমনকী নিউরো-সাইকোলজিস্টকেও আনতে পারবেন উনিই। ওঁর ডিপার্টমেন্টেই আছে মোবাইল ফিল্ড ল্যাবরেটরি। গাড়িগুলো রয়েছে নানা অঞ্চলের গ্যারেজে—শিবালয়ের কাছাকাছি গ্যারেজে নিশ্চয় আছে। আমি একটু পরেই
তাঁকে ফোন করছি। তার আগে তুই তাঁকে জানিয়ে রাখ—’

‘রাখছি। আর কী চাহিদা?’

‘একটা শর্টওয়েভ রেডিয়ো। এখানকার রেডিয়ো বিগড়েছে। টেলিফোনও যখন তখন বন্ধ হচ্ছে—’

‘যাচ্ছে—রেডিয়ো ভ্যানেই থাকবে। আর কী?’

‘টেলিফোনের কাছে হাজির থাকিস। শিবালয় ওয়ার্ল্ড নিউজ হয়ে যেতে পারে রাত ভোর হলেই। তোকে যেন পাই।’

‘নিউজ যাতে না হয়, সে চেষ্টা করছি। পেজার আর সেলুলার ফোনও পাঠিয়ে দিচ্ছি। বিনিময়ে তোকে শুধু একটা কথা দিতে হবে। এমন কিছু ঝুঁকি নিবি না যাতে সুরেশ সাইকিয়া হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে।’

‘কথা দেওয়া সম্ভব নয়। ছাড়ছি।’

রিসিভার রেখে দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন পুলিশ প্রধান। দেখলেন রেডিয়োর সামনের প্লেট খোলা হয়ে গেছে। ফায়ার আর্মসগুলোয় কার্তুজ ঠাসা চলছে। পরি কফি বানাচ্ছে।

ফের টেলিফোন তুললেন। ডায়াল টোন এল না। অথচ কে যেন রয়েছে অপর প্রান্তে। সে কান পেতে শুনছে।

‘হ্যালো,’ বললেন সুরেশ। জবাব নেই।

মাধবী লাহাও ঠিক এই পরিস্থিতিতে পড়েছিল। উপলব্ধি করেছিল, কে যেন বোবা হয়ে রয়েছে ওদিককার রিসিভারে।

‘কে তুমি?’ আস্তে বললেন পুলিশ প্রধান।

জবাবের আশা করেননি—কিন্তু জবাব পেলেন।

কণ্ঠস্বর নয়। খুব চেনা একটা শব্দ। পাখি ডাকছে। খুব সম্ভব গাংচিল। হ্যাঁ, গাংচিলের ডাক। জোর হাওয়া বইছে সমুদ্রতীরে—সেই আওয়াজের ওপর গলা চড়িয়ে ডাকছে গাংচিল।

পালটে গেল আওয়াজ। খটখটাখট খটখটাখট শব্দ হচ্ছে। ফোঁপরা লাউয়ের খোলে কাঁইবিচি রেখে যেন নাড়া হচ্ছে। কোথায় যেন এ-আওয়াজ শুনেছেন সুরেশ।

র‍্যাটলস্নেক!

হ্যাঁ। বিষধর র‍্যাটলস্নেকের ওয়ার্নিং সিগন্যাল। না, ভুল হয়নি। ওই সাউন্ড ভোলা যায় না।

সে শব্দও পালটে গেল। ইলেকট্রনিক গুঞ্জন। না, ইলেকট্রনিক নয়। মৌমাছির গুঞ্জন। ঝাঁক বেঁধে গুনগুন করছে।

আবার শোনা গেল গাংচিলের চিৎকার। গান গেয়ে উঠল আর একটা পাখি—ভারী মিষ্টি ডাক। সেই সঙ্গে জিব বের করে হাঁপানির আওয়াজ। কুকুর নাকি?

চাপা গজরানি। না, কুকুর নয়। আরও বড় জানোয়ার। ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে আঁচড়াচ্ছে কামড়াচ্ছে লড়ছে একাধিক বেড়াল।

গা হিম হয়ে এল সুরেশ সাইকিয়ার।

থেমে গেল ইতর প্রাণীদের চেঁচানি।

কান পেতে রইলেন সুরেশ। বললেন খাটো গলায়, 'কে তুমি?'

জবাব নেই।

'কী চাও?'

যেন বরফ দিয়ে তৈরি ছুরির মতন অনেকগুলো তীক্ষ্ণ চিৎকার তারের মধ্যে দিয়ে ভেসে এসে বিঁধে গেল কানে। কলজে-ছেঁড়া চিৎকার করে যাচ্ছে পুরুষ, নারী, শিশু। বহুজনে। অ্যাকটিং নয়—রিয়্যাল। আতঙ্কে যন্ত্রণায় এইভাবে চেঁচায় মানুষ।

রক্ত উত্তাল হল সুরেশ সাইকিয়ার—উদ্দাম হল হৃৎপিণ্ড, মনে হল যেন নরকের দরজা খুলে গেছে কানের পর্দায়। চেঁচাচ্ছে কারা? শিবালয় শহরে যারা ছিল, যারা মরে গেছে—তারা?

টেপরেকর্ডে ধরা ছিল চিৎকারগুলো? কে ধরে রেখেছে? এই স্মৃতির দরকার কী?

চরম চিৎকারটা একক হয়ে বেজে উঠল সবশেষে। বাচ্চা গলায় আকুল সেই চিৎকার শুনে মনে হল যেন টেনে টেনে তার হাত-পা ছেঁড়া হচ্ছে। পাক খেয়ে খেয়ে চিৎকারটা চূড়ান্ত হয়ে যেতেই থেমে গেল হঠাৎ।

আবার সেই নৈঃশব্দ্য। এবার আরও ভয়াবহ। আরও স্পষ্টভাবে টের পাচ্ছেন সুরেশ সাইকিয়া তারের অপর প্রান্তের সত্তাকে। অতিশয় অশুভ সত্তা। নীরব।

আস্তে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন পুলিশ প্রধান। লোম খাড়া হয়ে গেছে তাঁর। আঙুল কাঁপছে। ঘাম জমেছে কপালে—গড়াচ্ছে ঘাড়ের পেছনে।

ঘরের কেউ তাঁর এই অবস্থা লক্ষ করছে না। ব্যস্ত যে যার কাজ নিয়ে। এই মুহূর্তে মুখ খুলতেও চান না পুলিশ প্রধান। গলা কেঁপে যাবে। তিনি যে লীডার...

আবার হাত বাড়ালেন রিসিভারের দিকে। তুলে নিলেন।

ফিরে এসেছে ডায়াল টোন।

ডাক দিলেন কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার প্রোজেক্টের সিভিলিয়ান ডিফেন্স ইউনিটকে।

পরি খেতে দিল সবাইকে। সুমন্তর টেবিলে। ঠিক তখনই আলো কেঁপে উঠল মাথার ওপর। একবার... দু'বার... তিনবার...

আলো কাঁপছে বাইরেও... রাস্তায়... একবার... দু'বার... তিনবার...

নিভে গেল সমস্ত আলো।



সুরেশ সাইকিয়া আলো নেভার আগেই টেলিফোনের কাজ সেরে নিয়েছিলেন। কর্নেল ডিসুজার বাড়িতে ফোন করেছিলেন। জানতে চেয়েছিলেন, শিবালয় শহরের এই বিপর্যয়ের মূলে রয়েছে কী ধরনের এজেন্ট, কেমিক্যাল না বায়োলজিক্যাল। ডিসুজা শুধু বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।' তার বেশি কিছু না। তবে সাবধান করেছিলেন সুরেশকে। টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না। যা বলবার, সামনাসামনি বলবেন। ভোরের দিকে ফিল্ড ল্যাব আর তদন্তকারীদের নিয়ে হাজির হবেন।

আলো কেঁপে উঠে নিভে গেল তারপরেই।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, এই জাতীয় বিভ্রাট ঘটলে কী করতে হবে। ঠিক তাই করা হল এখন।

সাতজনে গোল হয়ে কাঁধে কাঁধ আর পিঠে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘরের ঠিক মাঝখানে। দেওয়াল থেকে দূরে, জানলা থেকে তফাতে। বাড়তি দুটো লম্বা টর্চলাইট পাওয়া গেছিল ফাঁড়িতে। এখন সব ক'টা জ্বলছে আর ঘুরছে।

থপ শব্দটা পাওয়া গেল সেই সময়ে... আলো ঠিকরে গেল দেওয়ালে, কড়িকাঠে, মেঝেতে। কিন্তু কোথাও কিছু নেই।

আবার শব্দ ভেসে এল—থপ... থপ... থপ...

শব্দ বাড়ছে...

টর্চ ঘুরে গেল জানলার দিকে। বন্ধ কাচের বাইরে পাখনা ঝাপটাচ্ছে একটা আতঙ্ক।

দুটো চোখ তার জ্বলছে টর্চের আলোয়। দেহ প্রকাণ্ড—দুটো ফুটবল পাশাপাশি জুড়লে যত বড় হয় তত বড়। তার দু'পাশের পাখনা আরও বড়—গোটা জানলা জুড়ে রয়েছে। সবেগে আছড়ে পড়ছে কাচের ওপর কিন্তু কাচ ভাঙবার মতন দেহভার তার নেই। অতীব সূক্ষ্ম কলেবর। তাকে ফুঁড়ে বাইরের আলো দেখা যাচ্ছে।

ঠিক যেন একটা অতিকায় মথ পোকা!

থপ থপ থপ থপ...

মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে... পড়ছে... পড়ছে... নারকীয় জিঘাংসা ঠিকরে যাচ্ছে বহুরঙা দুই চোখ থেকে!

আচমকা বিদায় নিল সে।

কিছুক্ষণ কেউ নড়ল না।

জ্বলে উঠল সমস্ত আলো। ঠিকরে ঘর থেকে রাস্তায় নেমে এল সকলেই। কেউ নেই রাস্তায়। পতঙ্গ ওঁত পেতে নেই। কোত্থাও।

অথবা হয়তো আলোয় সে হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।

বৈঠক বসল তারপরেই। নানা মুনির নানা মত শোনা গেল সেই বৈঠকে। উড়ুক্কু বিভীষিকাকে কেউ বলল অতিকায় মথ পোকা, কেউ বলল অজানা এক পাখি। কিন্তু রমেশকে নিশ্চয় তুলে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা নেই এই উড়ুক্কু বিভীষিকার। জানলার কাচ ভাঙবার ক্ষমতাও তো তার নেই। তবে সে এল কোত্থেকে? গেলই বা কোথায়?

সুরেশ সাইকিয়া তখন বললেন, টেলিফোনে যা-যা শুনেছিলেন।



গুম হয়ে রইল মাধবী। তারপর বললে, ‘পাহাড়ের কোনও গুহা থেকে এই আতঙ্কের আবির্ভাব ঘটেনি তো? সেখানেই হয়তো মাকড়সার মতন জাল পেতেছে... শিবালয়ের বাসিন্দাদের আটকে রেখেছে জ্যান্ত। খিদে পেলে খাবে। তাদেরই গলা শুনলেন টেলিফোনে।’

হাসতে পারলেন না সুরেশ সাইকিয়া। শুধু বললেন, ‘ও সব সায়েন্স ফিকশনে মানায়। এতগুলো মানুষকে জবাই করা বা বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা ওই পোকার নেই।’

পরি বলে উঠল, ‘কুকুরদের ধরবার ক্ষমতাও নেই।’

মনে পড়ে গেল মাধবীর। শিবালয় শহরে বেশ কয়েকটা জার্মান শেফার্ড আছে, একটা ডোবারম্যান আর একটা গ্রেটডেন আছে। এরা এখনও হাঁকডাক করছে না কেন? শহর একেবারে নিস্তব্ধ। এদেরকে কাবু করাও তো সহজ নয়।

সবচেয়ে কঠিন হল বেড়ালদের কব্জায় আনা। বৃহৎ শক্তিও পারে না। তবে এরা গেল কোথায়?

সুরেশ সাইকিয়া মাধবীকে বললেন, ‘বেশ কিছু লোক আসছে। তাদের থাকার জায়গা দরকার। এক ঘরে একসঙ্গে থাকতে চাই। হেডকোয়ার্টার করব সেখানেই। অপারেশন চলবে সেখান থেকেই। এরকম ঘরের সন্ধান দিতে পারবেন?’

ভেবে নিয়ে মাধবী বললে, ‘একটু দূরেই একটা বড় কাফেটেরিয়া আছে। নিচের তলায় বড় বড় দু’খানা ঘর। একটায় শোয়া যাবে আর একটায় খাওয়া যাবে।’

‘চলুন, দেখে আসি।’

‘এখন?’ মাধবীর চোখ ঘুরে গেল জানলার দিকে। যেখানে একটু আগেই রহস্যময় কালো পতঙ্গ ডানা ঝাপটে গেছে।

সুরেশ সাইকিয়া উঠে পড়ে বললেন, ‘চুপচাপ বসে থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, এখানে বসে থেকেও আপনি নিরাপদ নন।’

‘তা নই,’ উঠে পড়ল মাধবী, ‘নিরাপত্তা এই শহরের কোত্থাও নেই। শহরটাকে চেনাই যাচ্ছে না।’

শচীন আর সুধাকরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন সুরেশ সাইকিয়া। তিনজনের হাতেই শটগান। এদের গা ঘেঁষে চলেছে মাধবী। স্ট্রিট ল্যাম্পের অম্বর-প্রভার বাইরে চাঁদের আলোয় ধোওয়া পথ মাড়িয়ে চলেছে চারজনে।

শহর যেন দমবন্ধ করে রয়েছে। গাছগুলোও রুদ্ধশ্বাস। দু’পাশের বাড়িগুলো বাষ্প-স্বচ্ছ প্রতিকৃতির মতন যেন ঝুলছে দু’পাশে।

সুরেশ সাইকিয়া চলেছেন সবার আগে। কী যেন পায়ে মাড়িয়ে ফেললেন। চমকে উঠলেন। শুকনো ঝরাপাতা।

চারতলা বাড়িটা এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে। মাধবী চিনিয়ে দিয়েছে ওই বাড়িতেই বসবে হেডকোয়ার্টার। গোটা বাড়িটা অন্ধকার। আলো নেই ভেতরে।

চারজনেই যখন রাস্তার ঠিক মাঝখানে, ঠিক তখন অন্ধকারের ভেতর থেকে কী যেন ছিটকে এল ওদের দিকে। সুরেশ সাইকিয়া চাঁদের আলোয় দেখলেন, যেন জলের ওপর ঢেউ খেলে গেল—ফুটপাতের চাঁদের আলোকে জল বলেই ভ্রম হচ্ছিল। হেঁট হয়ে টুপ করে বসে পড়েছিলেন তৎক্ষণাৎ। কানে শুনলেন, ডানার আওয়াজ। আলতোভাবে মাথা ঘষটে কী যেন বেরিয়ে গেল।

আর্ত চিৎকার ঠিকরে এল শচীনের গলা চিরে।

তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন সুরেশ সাইকিয়া।

মথ পোকা!

নিবিড়ভাবে বেষ্টন করে রয়েছে শচীনের মুণ্ড। কীভাবে, তা বুঝতে পারলেন না সুরেশ।

এখন চেঁচিয়ে উঠেছে সবাই, ছিটকে সরে গেছে শচীনের কাছ থেকে। কুঁই-কুঁই ডাক ছাড়ছে মথ পোকা—উচ্চনিনাদী। কানে যন্ত্রণা ধরানো ডাক।

চাঁদের রুপোলি আলোয় মখমল কোমল ডানা আরও ভালোভাবে লেপটে ধরল শচীনের গোটা মুণ্ড আর ঘাড়।

টলতে টলতে পেছিয়ে যাচ্ছে শচীন। অন্ধের মতন। দু'হাতে মুখমণ্ডলে লেপটে থাকা উৎপাতকে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। আস্তে আস্তে কমে আসছে আতীক্ষ্ণ হাহাকার। সেকেন্ড দুয়েক পরে কুলুপ পড়ল গলায়।

যেন পক্ষাঘাতে পঙ্গু সুরেশ সাইকিয়া, মাধবী আর সুধাকর।

দৌড়তে গেল শচীন। কয়েক পা গিয়েই থমকে গেল। দু'হাতে মুখ আঁকড়ে ছিল এতক্ষণ, এবার ঝুলে পড়ল দু'পাশে। এখন ওর হাঁটু ভেঙে যাচ্ছে।

পক্ষাঘাত কাটিয়ে উঠেছেন সুরেশ সাইকিয়া। শটগান বাগিয়ে দৌড়েছেন শচীনের দিকে।

দু'হাঁটু ভেঙে গেলেও পড়ে গেল না শচীন। কম্পমান দুই হাঁটুকে গায়ে গায়ে ঠেকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঝাঁকুনি দিয়ে দুই কাঁধ বেঁকিয়ে নিয়েছে। মুচড়োচ্ছে গোটা শরীর, ঠিক যেন ইলেকট্রিক কারেন্ট বয়ে যাচ্ছে শরীরের মধ্যে দিয়ে।

এক হাত বাড়িয়ে শচীনের মুখ থেকে মথ পোকাকে টেনে ছিঁড়ে আনতে গেছিলেন সুরেশ। তার আগেই নেচে উঠেছিল শচীন—যন্ত্রণা আর শ্বাসকষ্ট আর যেন সইতে পারছে না। দু'হাতে খামচে ধরছে বাতাস। নেচে নেচে রাস্তার ওপর দিয়ে ছুটে

যাচ্ছে, কাঁধ দুলছে ডাইনে-বাঁয়ে—যেন পুতুলনাচিয়ের সুতোর টানে নেচে চলেছে গোটা শরীর। দু'হাত শিথিল হয়ে ঝুলছে শরীরের দু'পাশে। হাতের মুঠি খুলছে, ফের বন্ধ হচ্ছে, কিন্তু কখনওই উঠে এসে খামচে ধরছে না মুখ-ঘিরে-থাকা কদাকার আতঙ্ককে। এই মুহূর্তে তার নাচ যেন পরম সুখের—যন্ত্রণার নয়। পেছন পেছন এগিয়েছিলেন সুরেশ তবে কাছে যাওয়ার আগেই...

রাস্তায় লুটিয়ে পড়েছিল শচীন।

সেই মুহূর্তে শূন্যে উঠে পড়ল মথ। স্বল্পক্ষণের জন্যে ভেসে রইল বাতাসে দুই ডানায় ভর দিয়ে। দুই চোখ অমনিশাকালো অসীম ঘৃণায় পরিপূর্ণ। ছোঁ মারল সুরেশের দিকে।

পিছিয়ে এসেই দুই বাহু দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিয়েছিলেন—পড়ে গেছিলেন রাস্তায়।

তাঁর মাথার ওপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল মথ।

মোচড় মেরে শরীর ঘুরিয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলেন সুরেশ। ঘুড়ির সাইজের মথ নিঃশব্দে পিছলে চলে যাচ্ছে শূন্যপথে রাস্তা বরাবর। ওদিকের বাড়ির সারির দিকে।

শটগান তুলে ধরেছে সুধাকর, নির্ঘোষ ধ্বনি কামান গর্জনের মতো কাঁপিয়ে দিল শহরকে।

সোজা যেতে যেতে হেলে গিয়ে ঠিকরে গেল মথ। লটপটিয়ে রাস্তায় আছাড় খেতে খেতেও সিধে হয়ে উঠে গেল ওপরে—মিলিয়ে গেল বাড়ির ছাদের ওপর দিয়ে।

চিৎপাত হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে শচীন। নড়ছে না।

তার মুখ নেই। মুখটা যেন ছিড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চুল আছে, কপাল ঘিরে চামড়ার ফিতে দেখা যাচ্ছে সাদা হাড়ের ওপর। কঙ্কাল মুখ চেয়ে আছে আকাশপানে।

সোফায় শোয়ানো রয়েছে শচীনের মৃতদেহ। চাদর দিয়ে ঢাকা ঘরের মাঝখানে ছ'জনে বসে মুখোমুখি। কেউ কারও চোখের দিকে তাকাতে পারছে না। দম আটকানো অস্বস্তি সইতে পারল না মাধবী। টর্চ হাতে উঠে গেল মৃতদেহের কাছে। চাদর সরিয়ে টর্চ ফেলে দেখল। চাদর টেনে দিয়ে এসে বসল চেয়ারে।

বললেন সুরেশ সাইকিয়া ধরা গলায়, 'কী দেখলেন?'

কেশে গলা সাফ করে নিয়ে মাধবী বললে, 'এরকম মৃত্যু কী করে সম্ভব হয়, তাই ভাবছি। রাস্তায় রক্ত পড়ে থাকতে দেখেছিলেন? দেখেননি। চোখ নেই কোটরে—রক্ত পড়েছে কি জামায়? নেই। থই থই রক্তের মধ্যে পড়ে থাকা উচিত ছিল যার, তার শরীরের মধ্যে একফোঁটা রক্ত নেই। শিরাগুলো দেখলেই বোঝা যাচ্ছে। শুধু রক্ত নয়

—গোটা ব্রেন উধাও। চোখ, নাকের তরুণাস্থি, দাঁতের মাড়ি, জিব—গোড়া পর্যন্ত সমস্ত দশ থেকে বারো সেকেন্ডের মধ্যে নিমেষে পান করেছে ওই পোকা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পান করেছে। সবই অ্যাসিড জাতীয় কিছু দিয়ে গালিয়ে পুড়িয়ে চোখের পলক ফেলবার আগেই গিলে ফেলেছে। আমি আর ভাবতে পারছি না।'

সুরেশ সাইকিয়া ম্লানস্বরে বললেন, 'দোষটা আমারই। রাস্তায় না বেরলেই হত।'

মাধবী বললে, 'রাস্তায় পরে বেরলেও একই ঘটনা ঘটত। অন্তত একজনের অবস্থা এই রকম হত। দেখিয়ে দিল ওদের ক্ষমতা কতখানি। ফোর্স নিয়ে এসে করবেন কী? শটগান নির্ভুল লক্ষ্যে আঘাত হেনেছে। টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হয়নি। চোখে আঙুল দিয়ে ওরা দেখিয়ে দিয়ে গেল—ওদের খপ্পর থেকে পরিত্রাণ নেই। হয়তো ডাইনোসরদের আমলে ছিল এমন পতঙ্গ, কিন্তু হঠাৎ এখানে এল কীভাবে?'

ঘর নিস্তব্ধ। ক্ষণপরেই শোনা গেল দূরায়ত ক্ষীণ গুঞ্জন।

জানলায় দৌড়ে গেল ছ'জনেই। দূর রাস্তায় লাল আলোর ফ্ল্যাশ দেখিয়ে আসছে। তিনটে গাড়ি।

আলো কাঁপল এই সময়ে। নিভু নিভু হয়ে ফের জ্বলে উঠল।

রাত এগারোটা বেজে পনেরো মিনিট। শুরু হল ডাকিনী মুহূর্তের প্রতীক্ষা...



ভুজঙ্গ বোনার্জী কলকাতায় এসেছেন দিল্লি থেকে বিজনেসের ব্যাপারে।

এখন সকাল আটটা। দিনটা বড় বিষন্ন ধূসর মেঘ ভেসে যাচ্ছে শহরের ওপর দিয়ে। ভোর থেকেই ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিও চলছে। ভিজে গাছগুলোর ডালপালা নেতিয়ে নিঝুম। ফুটপাত দিয়ে যারা হাঁটছে, তাদের সবার মাথায় ছাতা।

রকফেলার হোটেলের জানলার কাচে বৃষ্টি আছড়ে পড়ে গড়িয়ে নামছে। ডাইনিং রুম থেকে দেখা যাচ্ছে না বাইরের দৃশ্য।

জানলার কাছের টেবিলে বসে আছেন ভুজঙ্গ বোনার্জী। ব্রেকফাস্ট বিলের কৈফিয়ৎ দেবেন কীভাবে ম্যানেজমেন্টকে—তাই ভাবছেন। যে অতিথির আপ্যায়নের জন্যে এলাহি খাবার-দাবারের অর্ডার দিয়েছেন, তাঁর অর্ডার দেওয়া এখনও শেষ হয়নি।

ডক্টর উতঙ্ক চৌধুরী বসে আছেন টেবিলের ওদিকে। ভুজঙ্গ বোনার্জী তাজ্জব হয়েছেন ওঁর খিদের বহর দেখে। উতঙ্ক চৌধুরীর চশমার ব্রিজ ভেঙে গেছিল—ঝালাই করা হয়েছে। নিশ্চয় নিজেই করেছেন, পয়সা বাঁচানোর জন্যে। দক্ষ মিস্ত্রীর হাতে পড়লে ঝালাই দেখা যেত না। বয়স আটান্ন, কিন্তু বেশি বুড়িয়েছেন। সাদা চুল কানের ওপর লতিয়ে নেমেছে। ঘাড় সরু, চামড়ায় অজস্র ভাঁজ। শরীরে হাড় আর তরুণাস্থি বেশি—মাংস কম। এত যে অর্ডার দিলেন, সব খাবার খেতে পারবেন কি না সন্দেহ।

কিন্তু তিনি খেয়েই যাচ্ছেন। খেতে খেতেই শুধোলেন ভুজঙ্গ বোনার্জীকে, 'দিল্লি থেকে উড়ে এলেন শুধু আমার সঙ্গে কথা বলতে? প্লেন ফেয়ার তো সাড়ে চার হাজার, তাই না?'

'শুধু আপনার সঙ্গে নয়, আরও কয়েকজন লেখকের সঙ্গে কথা বলব,' অমায়িক গলায় বললেন ভুজঙ্গ। 'বইয়ের বাজার মার খাচ্ছে। বৈচিত্র দরকার। লেখকের নাম নয়, চাই বিষয়।'

'তার মানে, বিষয়ের কথা ভেবেই এসেছেন আমার কাছে?'

'আপনার "আদিম শত্রু" বইটা আমি পড়েছি। প্রথম সংস্করণ। অসাধারণ।'

'অসাধারণই বটে।' বিষন্ন এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল ডঃ চৌধুরীর ওষ্ঠে। 'ওই বই প্রকাশ পাওয়ার আঠারো মাসের মধ্যে শেষ হয়ে গেলাম আমি। গণ্যমান্য পণ্ডিতরা রায় দিলেন আমার থিয়োরিগুলো নাকি অবাস্তব, বিজ্ঞানসম্মত নয়। জোর করে উত্তেজনা সৃষ্টি করে আমি নাকি সাধারণ মানুষের কাছে রাতারাতি বিখ্যাত হতে চাইছি। ঘরে-বাইরে জুটল কেবল বিদ্রুপ আর অবজ্ঞা। বাধ্য হয়ে ইউনিভার্সিটির চাকরিটা ছাড়তে হল। ভাবলাম কোপারনিকাসকেও তো একদিন উপহাস করেছিল লোকে। গ্রহ-তারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলেছিলেন বলে চার্চের রোষের শিকার হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু পরে জানা গেল তাঁর কথাই ঠিক।

কফিতে চুমুক দিলেন ভুজঙ্গ। বললেন, 'আপনার থিয়োরি এখনও চালু আছে বলে কি মনে হয় আপনার?'

'নিশ্চয়। ইতিহাস হাতড়ালেই দেখবেন, অজস্র রহস্যময় অন্তর্ধানের কোনও সমাধান যুগিয়ে উঠতে পারেনি ঐতিহাসিক আর প্রত্নতত্ত্ববিদ পণ্ডিতরা।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন উতঙ্ক চৌধুরী। ঝোপের মতন পুরু ভুরুর নিচে ছলছলে চক্ষুযুগলে যেন সম্মোহনী শক্তি জাগ্রত করলেন। বললেন, '১৯৩৯ সালে দশই ডিসেম্বর নানকিং পাহাড়ের বাইরে দশ হাজার চীনে সৈন্য অদৃশ্য হয়ে গেছিল। কোনও চিহ্ন রেখে যায়নি। যুদ্ধ করেও মরেনি। একটা দেহও দেখতে পাওয়া যায়নি। জাপানিজ মিলিটারি ঐতিহাসিকরা এই দশ হাজার সৈন্যের আর কোনও হদিস পায়নি। স্রেফ ভ্যানিশড। যেখান দিয়ে গেছিল এই দশ হাজার সৈন্য, সেখানকার চাষারাও তাদের যাওয়ার আওয়াজ শোনেনি। একটা বন্দুক ছোঁড়ার আওয়াজও পায়নি, স্রেফ বাতাসে মিশে গেল গোটা একটা আর্মি। আবার দেখুন, ১৭১১ সালে স্প্যানিশ যুদ্ধে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল চার হাজার সৈন্যের একটা বাহিনী!'

জ্বলজ্বল করছে প্রফেসরের চোখ। বইতে লেখা প্রতিটি পৃষ্ঠা যেন দেখতে পাচ্ছেন, 'মায়া শহরে একই কাণ্ড ঘটেছে আরও ব্যাপকভাবে। শুধু একটা শহরে নয়—পরের

পর শহরে। হাজারে হাজারে, লাখে লাখে শহর ছেড়ে চলে গেছে আন্দাজ ৬১০ খ্রিস্টাব্দে। খুব সম্ভব এক সপ্তাহের মধ্যে—একদিনেই, কেউ পালিয়েছে উত্তরে—নতুন শহরের পত্তন ঘটিয়েছে। তবে অসংখ্য মানুষ যে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সে প্রমাণও আছে। রান্নার বাসনপত্র পর্যন্ত নিয়ে যায়নি। উর্বর জায়গা পেলে মানুষ সেদিকে চলে যায় ঠিকই, কিন্তু দরকারি জিনিসপত্র ফেলে যাবে কেন? ফেলে গেলে, পরে এসে নিয়ে যায়নি কেন? কয়েকটা শহর দেখা গেছে, খাবার সাজিয়ে বসেছিল কিন্তু না খেয়ে চলে গেছে। একমাত্র আমার থিয়োরি ছাড়া আর কোনও থিয়োরি দিয়ে অদ্ভুত এই ঘটনাগুলোর ব্যাখ্যা করা যায় না।'

'শুনেও তো ভয় লাগছে,' বললেন ভুজঙ্গ।

'লাগবেই তো।'

আর কোনও কথা না বলে খাবার নিয়ে তন্ময় হয়ে রইলেন প্রফেসর। যেন, দীর্ঘদিন ভালো জায়গায় ভালো খাবার-দাবার জোটেনি।

তারপর শুরু করলেন, 'পৃথিবীতে যত রকম রহস্যজনক অন্তর্ধান ঘটেছে, সব ক'টার ব্যাখ্যা আমার এই একটা থিয়োরি দিয়ে করার চেষ্টা করেছিলাম। সেটাই অন্যায় করেছিলাম। আর কিচ্ছু করিনি। লাখে লাখে মানুষ আর ইতর জীব রাতারাতি কেন শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে—তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মরেছি।'

ভুজঙ্গ বললেন, 'আপনার বই পাবলিশড হওয়ার পর সেরকম ঘটনা আর ঘটেছে?'

'ঘটেছে, ঘটেছে, ভ্যানিশ হওয়ার ঘটনা আবার ঘটেছে।'

'সে কী! তাহলে তো খবরের কাগজে তা ছাপা হত!'

'হয়নি তো কী করব! তবে দুটো ঘটনার খবর আমি জানি। একটা খবর ছুঁয়ে যাওয়া হয়েছিল নিউজ পেপারে—কেননা অদৃশ্য হয়েছিল মাছ—মানুষ নয়। আমি জেনেছিলাম সায়েন্টিফিক জার্নালে। বছর আষ্টেক আগে প্রশান্ত মহাসাগরের একটা অঞ্চলে বেশ কয়েক প্রজাতির মাছ নাটকীয়ভাবে কমে যায়। সংখ্যায় অর্ধেক হয়ে যায়।'

'জলদূষণ,' বললেন ভুজঙ্গ।

'কয়েকশো বর্গমাইল জুড়ে জলদূষণ ঘটা সহজ নয়। সেরকম কোনও পদার্থও আবিষ্কার করা যায়নি। তা ছাড়া, মরা মাছগুলো তীরে ভেসে আসেনি, স্রেফ অদৃশ্য হয়ে গেছিল। চিহ্ন না রেখে।'

উত্তেজিত হলেন ভুজঙ্গ বোনার্জী। টাকার গন্ধ পেলেন। ভদ্রলোকের নাকে বেস্টসেলারের গন্ধ ঠিক ধরা পড়ে—আজও ভুল হয়নি। উতঙ্ক চৌধুরীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, "আদিম শত্রু" বইটার শুষ্কতা পরিহার করে সরসভাবে সাধারণ

পাঠকের জন্যে লিখতে হবে, এবং অবশ্যই ইংরেজি ভাষায়। নাম দেবেন "দি অ্যানসিয়েন্ট এনিমি"। ওয়ার্ল্ড মার্কেট অবধারিত।

মুখে বললেন, 'আর একটা কেস কী?'

'১৯৮০-তে ঘটেছিল আফ্রিকায়। মধ্য আফ্রিকার একটা দুর্গম জায়গা থেকে বাতাসে মিলিয়ে গেছিল তিন-চার হাজার জংলি মানুষ। গ্রাম খালি, জিনিসপত্র যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে, খাবারদাবার পর্যন্ত। যেন, সব ফেলে দিয়ে হঠাৎ পালিয়েছে জঙ্গলে। খানকয়েক মাটির পাত্র শুধু ভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছিল। রাজনৈতিক কারণে গণহত্যা হয় ওই অঞ্চলে। সেক্ষেত্রে লাশ পড়ে থাকে। এ গ্রামে তা নেই। কয়েক সপ্তাহ পরে জানা গেল, ওই অঞ্চলে জন্তু জানোয়ারের সংখ্যাও অবিশ্বাস্যভাবে কমে গেছে। দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র আছে, কিন্তু কারুর মাথায় তা আসেনি।'

'আপনি কিছু জানেন?'

'আঁচ করেছি।'

'অদৃশ্য হওয়ার ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটছে বহু দূরের অঞ্চলে—যাচাই করা কঠিন।'

'ঠিক। বেশির ভাগ ঘটনা ঘটছে সমুদ্রে—কেননা, ভূগোলকের সবচেয়ে বেশি জায়গা জুড়ে আছে সমুদ্র। চাঁদ যেমন নাগালের বাইরে, সমুদ্রও তাই। আর, সমুদ্রের তলায় কী ঘটছে, তা তো জানার বাইরে।'

'আপনার কি মনে হয়, সভ্য দুনিয়ায়, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এমন ঘটনা আজও ঘটতে পারে?'

'নিঃসন্দেহে।'

'কলকাতায় বা দিল্লিতে?'

'নিশ্চয়। আমার বইতে ভূত্বকের নিচে কোথায় এমন জায়গা রয়েছে, তার ম্যাপ এঁকে দেখিয়ে দিয়েছি।'

সার্সির গায়ে আরও জোরে আছড়ে পড়ল বৃষ্টি।

উতঙ্ক চৌধুরীর থিয়োরী বিশ্বাস করেননি ভুজঙ্গ বোনার্জী। তবে বুঝেছিলেন, এই বিষয়ের বইয়ের কাটতি আছে।



হোটেলটাকে এখন কেল্লা বানিয়ে নেওয়া হয়েছে।

বড় ঘরগুলোর মেঝেতে তোশক গদি ফেলে শুয়েছে সবাই। প্রহরী মোতায়েন রয়েছে লিফট আর দরজায়। জানলাগুলোর বাইরে থেকে ধাক্কা পড়লেই সজাগ হওয়া যাবে।

চারিদিকে নিশ্চিদ্র নীরবতা।

রাত গভীর হয়েছে।

বড় ঘরের লাগোয়া ছোট্ট ঘরটায় পাঁচমিশেলি জিনিস রাখা হয়। এ ঘরে আলো জ্বলছে না। জানলা নেই।

ঘরদোর পরিষ্কার করার কেমিক্যালের হালকা সুবাস ভাসছে বাতাসে। লাইসল। ফিনাইল। ফার্নিচার পালিশ। মেঝে ঘষার মোম। দেওয়ালের তাকে সাজানো রয়েছে।

দরজা থেকে দূরতম কোণে, ডানদিকে রয়েছে বড় সাইজের মেটাল সিঙ্ক। কলে লিক আছে। টপ টপ করে জল পড়ছে। দশ থেকে বারো সেকেন্ড অন্তর একটা করে ফোঁটা। প্রত্যেকটা ফোঁটা ধাতুর চাদরে আছড়ে পড়ছে—আর শব্দ হচ্ছে—টং।

এই ঘরের মাঝখানে সোফায় শুয়ে আছে শচীন, চাদরে ঢাকা সর্বাঙ্গ।

নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু একঘেয়ে টং টং টং শব্দটা ছাড়া।

বাতাসে ভাসছে রুদ্ধশাস পূর্বাভাস।

ঘুম নেই সুরেশ সাইকিয়ার চোখে। উনি ভাবছেন, শহরের গৃহপালিত পশুগুলো গেল কোথায়?

আলোহীন, গবাক্ষহীন, পাঁচমিশেলি জিনিস রাখার ঘরে অব্যাহত রয়েছে ওই একটা শব্দ। মেটাল বেসিনে টং টং টং আওয়াজ সৃষ্টি করে যাচ্ছে জলের ফোঁটা।

কিন্তু ঘর একেবারে নিস্তব্ধ নয়। অন্ধকারে কী যে নড়ছে। নরম, ভিজে ভিজে, চোরা শব্দ গুঁড়ি মেরে ঘুরছে ঘরময়।

ঘুম নেই মাধবীর চোখেও।

সুরেশ সাইকিয়া টহল দিতে বেরিয়েছিলেন। মাধবীর চোখ খোলা দেখে দাঁড়িয়ে গেলেন।

মাধবী বললে, 'আপনার চোখে ঘুম নেই?'

সুরেশ বললেন, 'ছেলেটার জন্যে মন কেমন করছে।'

'আপনার ছেলে?'

'এক ছেলে। বছর খানেক আগে গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে ওর মা মারা যান। ছেলেটার ব্রেনে চোট লাগল। এক বছর হয়ে গেল—এখনও জ্ঞান ফিরে পায়নি।'

'কোমা?'

'হ্যাঁ।'

শচীনের লাশ যে-ঘরে, সেই ঘরে জল পড়া কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হয়েছিল। ফের শুরু হয়েছে।

টং।

শচীনের সোফা ঘিরে চুপি চুপি কি যেন ঘুরছে। আওয়াজ হচ্ছে ছপ... ছপ... ছপ...।

কাদায় পা পড়লে যেমন আওয়াজ হয়।

শুধু এই আওয়াজই নেই ঘরের মধ্যে। শোনা যাচ্ছে আরও অনেক শব্দ... খুব কোমল, মৃদু শব্দ। হাঁপাচ্ছে কুকুর। ফ্যাঁস করছে বেড়াল। চাপা হাসি—কচি গলার হাসি। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠছে একটি মেয়ে। গোঙানি। দীর্ঘশ্বাস। চড়ুই পাখির কিচিরমিচির। খুব আস্তে—বাইরের সান্ত্রীর কানে যেন না যায়। সাপের হিসহিসানি। র‍্যাটলস্নেকের কড়মড় বাদ্যি। মৌমাছির তীক্ষ্ণ গুঞ্জন। কুকুরের গজরানি।

আচমকা স্তব্ধ হল সমস্ত শব্দ। শুরু হয়েছিল হঠাৎ, শেষও হল হঠাৎ।

ফিরে এল নৈঃশব্দ্য।

এক মিনিট নৈঃশব্দ্য। আবার... টং।

আলোহীন ঘরে খসখস শব্দ... কাপড় চোপড়ে যেমন আওয়াজ হয়। শচীনের গা-ঢাকা চাদর খসে পড়ল মেঝের ওপর।

আবার পিছলে যাওয়ার আওয়াজ। শুকনো কাঠ ভাঙার আওয়াজ। চাপা শব্দে যেন হাড় ভাঙল।

আবার নৈঃশব্দ্য।

টং।

নৈঃশব্দ্য।

টং টং টং।

ভোরের দিকে ঘুম ভেঙে গেছিল পরির। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল রাস্তা একদম নিঝুম। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। এখনও আলো ফোটেনি আকাশে।

ভোরবেলা দৌড়োনোর অভ্যেস আছে পরির। এই সময়ে ঘুম ভাঙলে আর শুয়ে থাকতে পারে না। তাই উঠে পড়ল। বেরিয়ে এল করিডরে। দরজায় দাঁড়িয়ে সান্ত্রী। লিফটের পাশে সান্ত্রী। সদর দরজার ম্যাজিক হোল দিয়ে বাইরের বাগানের পথে নজর রেখেছে একজন সান্ত্রী।

পরি ভাবল লম্বা করিডরেই একটু পায়চারি করা যাক। হেঁটে করিডরের শেষে টয়লেটের দিকে চলে গেল পরি। আবার ফিরে এল। আবার গেল।

সান্ত্রীরা হাসছে ওর কাণ্ড দেখে।

ভয়ানক কাণ্ডটা ঘটল ঠিক তখনই!

হেঁটে টয়লেটের বন্ধ দরজাটার সামনে গিয়ে যেই অ্যাবাউট টার্ন করতে যাচ্ছে পরি, আস্তে ফাঁক হয়ে গেল টয়লেটের দরজা। খোলা হল ভেতর থেকে।

দরজার ফাঁকে দাঁড়িয়ে শচীন। যার লাশ শোয়ানো আছে ছোট ঘরে—সেই শচীন। কিন্তু এখন তার গোটা মুখটা রয়েছে—নেই শুধু চোখ। সে জায়গায় দুটো নিতল গর্ত।

বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিল পরি। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরি চোখ মেলে দেখে সে শুয়ে আছে বড় ঘরে। ওকে ঘিরে আছে সবাই।

মাধবী বললে, 'ভুল, দেখেছিস।'

'না দিদি, স্পষ্ট দেখেছি।'

‘তোর চিৎকার শুনেই সান্ত্রীরা দৌড়ে গেছিল। কেউ নেই টয়লেটে।’

‘আমি তাকে দেখেছি।’

‘সে এখন ছোট ঘরে।’

‘দেখেছ সেখানে আছে কি না?

মাধবী চাইল সুরেশ সাইকিয়ার দিকে। বেরিয়ে গেলেন তিনি হাতে রিভলভার নিয়ে। ফিরে এলেন। বললেন, ‘শুধু চাদর পড়ে মেঝেতে। শচীনের বডি নেই সোফায়।’

না, সান্ত্রীরা কেউ দেখেনি শচীনকে। দরজা তো বন্ধই রয়েছে। তা ছাড়া মরা মানুষ হেঁটে বেরিয়ে আসতে পারে না। অথচ ঘরে নেই জানলা।

আলো ফুটেছে আকাশে। শিবালয় শহরের চারপাশের পাহাড়ে পাহাড়ে এখন আলোর তরঙ্গ।

ঢাল বেয়ে নামছিল একটা শেয়াল। হঠাৎ থমকে গেল। একটা অপরিচিত গন্ধ পেয়েছে। গন্ধটা ভয়ের।

লোম খাড়া হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। সেই সঙ্গে ল্যাজ। তীরবেগে নেমে গেল ন্যাড়া পাহাড় বেয়ে। সামনে পড়ল ফুট দুয়েক চওড়া একটা গহ্বর। লাফ দিল তার ওপর দিয়ে। কিন্তু অপর পারে পৌঁছোতে পারল না।

বিদ্যুতের চেয়েও ক্ষিপ্রবেগে কী যেন লকলকিয়ে উঠল গর্তের ভেতর থেকে। সাপটে ধরল শূন্যপথের শেয়ালকে। নিমেষে টেনে নিল গর্তের মধ্যে। প্রায় পাঁচফুট গভীর গর্তের তলদেশে রয়েছে একটা সরু ফুটো। শেয়ালের শরীর সেই ফুটোয় ঢোকার কথা নয়। কিন্তু তবুও প্রচণ্ড টানের চোটে গোটা শরীরটা ঢুকে গেল তার মধ্যে, মড়মড় করে ভাঙতে লাগল হাড়।

নিস্তব্ধ চারিদিক।

পালে পালে পাহাড়ি ইঁদুর গুটি গুটি এসে দাঁড়াল গর্তের পাশে। চেয়ে রইল ভেতর দিকে। তারপর, একে একে লাফিয়ে নেমে গেল নিচে। প্রায় একশো ইঁদুর।

বেরিয়ে এল না কেউই।

খবর কিন্তু ছড়িয়ে গেল—

গভর্নমেন্টের হাজারো সতর্কতা সত্ত্বেও টেলিফোনে টেলিফোনে খবর চলে গেল। নানান দৈনিকের অফিসে। টনক নড়ল সংবাদ শিকারী সাংবাদিকদের।

ভোরের আলো ফোটবার পরেই শর্টওয়েভ রেডিয়ো আর ডিজেল-চালিত দুটো ইলেকট্রিক জেনারেটর পৌঁছে গেল শিবালয় টাউনের প্রান্তে। চার মাইল লম্বা

সড়কের মাঝামাঝি জায়গায় দু'খানা ভ্যান ফেলে রেখে পালিয়ে এল চালকরা।

যেখানে রোড ব্লক করে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে পুলিশের গাড়ি, সেখানে এসে খবর দিতেই রেডিয়ো মারফত খবর চলে গেল হেডকোয়ার্টারে। হেডকোয়ার্টার থেকে খবর চলে এল সুরেশ সাইকিয়ার কাছে।

রাস্তা থেকে ভ্যান দুটোকে নিয়ে আসা হল হোটেল হেডকোয়ার্টারে। শহরের জীবাণু যাতে বাইরে চলে না যায়, তা বন্ধ করা হল এইভাবে।

চালু হয়ে গেল শর্টওয়েভ রেডিয়ো। এখন টেলিফোন যন্ত্র বিকল হলেও টিকেন্দ্রনগরের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হবে না।

এক ঘণ্টার মধ্যেই একটা জেনারেটর চালু হয়ে গেল। শিবালয় সড়কের পশ্চিমে বাতিস্তম্ভগুলোকে এখন এই জেনারেটর জ্বালিয়ে রাখবে। আর একটা জেনারেটরের সঙ্গে তারের সংযোগসাধন ঘটানো হল হোটেলের ঘরে ঘরে। রহস্যজনকভাবে রাতে যদি আলো চলে যায়, দু'এক সেকেন্ডের মধ্যেই জেনারেটর অটোমেটিক্যালি চালু হয়ে যাবে। দু'এক সেকেন্ডের অন্ধকারে অদৃশ্য শত্রু নিশ্চয় আর কাউকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

সকালবেলাতেই স্নান সেরে নিয়েছিল মাধবী। প্রাতরাশ খেয়ে চারজন সান্ত্রীকে নিয়ে গেছিল নিজের বাড়িতে—ওষুধপত্র আর ডাক্তারি সরঞ্জাম আনতে। হোটেলে এমার্জেন্সি চিকিৎসার জন্যে।

গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। সান্ত্রীরা কাঠ হয়ে ঢুকেছিল একটার পর একটা ঘরে—যেন গিলোটিন উঁচিয়ে রয়েছে প্রতিটা ঘরে ঘরে।

জিনিসপত্র প্যাকেটে বেঁধে নিল মাধবী অফিস ঘরে বসে। টেলিফোন বেজে উঠল ঠিক তখনই। প্রত্যেকের চোখ এমন দূরভাষ যন্ত্রের ওপর।

বেজে বেজে থেমে গেল টেলিফোন। বাজল আবার। এবার রিসিভার তুলল মাধবী। কিন্তু হ্যালো বলল না।

নৈঃশব্দ্য।

প্রতীক্ষায় রইল মাধবী।

এক সেকেন্ড পরেই শোনা গেল দূরাগত গাংচিলের ডাক। মৌমাছিদের গুঞ্জন। বেড়াল বাচ্চাদের সরু গলাবাজি। মানুষের কচি বাচ্চার কান্না। পরমুহূর্তেই আর এক বাচ্চার খিলখিল হাসি। কুকুরের ডাক। র‍্যাটলস্নেকের কড়মড় মড়মড় বাদ্যি।

গত রাত্রে এইসব আওয়াজই শুনেছেন সুরেশ সাইকিয়া। টেলিফোনে। বিচলিত হয়েছিলেন। কেন হয়েছিলেন, তা এখন বুঝল মাধবী।

পাখি গান গাইছে।

ব্যাং কটর কটর করছে।

বেড়াল ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ ছাড়ছে।

ফ্যাঁস ফ্যাঁস ডাক গজরানিতে পরিণত হল—পরক্ষণে রাগের হুঙ্কার—হুঙ্কার পালটে ভয়ানক যন্ত্রণার কাতরানিতে।

পরক্ষণেই শোনা গেল শচীনের গলা, 'ডাক্তার নাকি? আমাকে দেখেই মূর্ছা গেল পরি! ছিঃ ছিঃ!'

দমাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল মাধবী। মুখ তার নিরক্ত। সান্ত্রীরা সাগ্রহে চেয়ে আছে তার দিকে। কিছুই ফাঁস করল না মাধবী। ঘাবড়ে যেতে পারে। এমনিতেই ভয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে।

সদলবলে বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। পথে পড়ল একটা ওষুধের দোকান। সেখানে ঢুকে আরও কিছু ওষুধ তাক থেকে নামিয়ে যেই প্যাক করতে যাচ্ছে, আবার বাজল টেলিফোন।

রিসিভার ধরল মাধবী। ভেসে এল শচীনের কণ্ঠস্বর, 'পালিয়ে কোথায় যাবেন?'

রিসিভার নামিয়ে রাখল মাধবী। এখন ওর হাত কাঁপছে।

দেখল সান্ত্রীরা। কিছু জিজ্ঞেস করল না।

সুরেশ সাইকিয়া বসেছিলেন টেলিফোন নিয়ে। কথা বলছেন টিকেন্দ্রনগর হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে।

বিনয় চৌধুরী নামে একজন ভদ্রলোকের সন্ধান পাওয়া গেছে কলকাতায়। মধ্যবয়স্ক। বইয়ের দোকান আছে। একটা নয়—দুটো। একটায় বেচেন নতুন বই আর একটায় শুধু পুরোনো বই। বেশি লাভ দ্বিতীয় দোকানে। বই পাগল মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। শিবালয় শহরে গেছিলেন বেড়াতে। উতঙ্ক চৌধুরী নামে কোনও ভদ্রলোকের নাম ওঁর খাতাপত্তরে পাওয়া যায়নি। অন্যান্য দোকান দশটার পর খুললে আরও খোঁজ নেওয়া যাবে।

'খোঁজ নিন। নামটা অদ্ভুত। খবর ঠিকই পাবেন।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখলেন সুরেশ সাইকিয়া। মাধবী ফিরল ঠিক তখন। মুখ তার পাণ্ডুরবর্ণ।

সঙ্কুচিত চোখে তা লক্ষ করলেন সুরেশ সাইকিয়া। শুধোলেন, 'কী হয়েছে?'

টেলিফোন বৃত্তান্ত খুলে বলল মাধবী।

'শচীনের গলা? অসম্ভব!' অবাক হয়েছেন সুরেশ।

'জানি। কিন্তু ওর গলা আমি চিনি।'

'কেউ ওর গলা নকল করেছে।'

চুপ করে রইল মাধবী। ভুল ওর হয়নি। বৃথা তর্ক করতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।

পরি ছুটতে ছুটতে এল ঠিক এই সময়ে, 'আসুন, আসুন, অদ্ভুত কাণ্ড। দেখে যান... শুনে যান!'

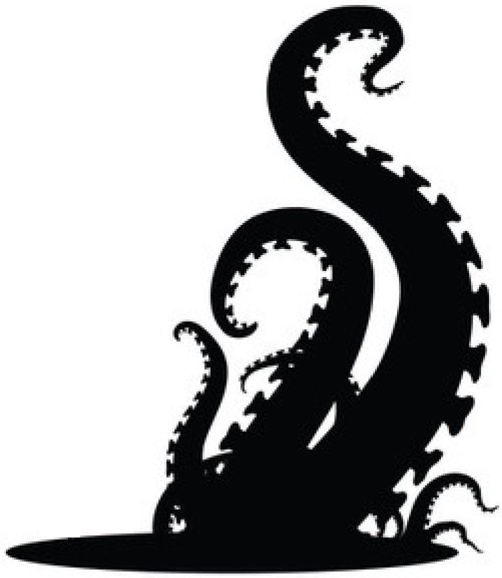
হোটেলের রান্নাঘর। সান্ত্রীরা অস্ত্র বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিমূঢ়ভাবে। বুঝতে পারছে না কী করবে। কেননা, আওয়াজটা আসছে সিঙ্কের ভেতর থেকে। কচি গলায় 'আবোল-তাবোল' বইয়ের ছড়া কাটছে। সিঙ্কের তলা থেকে পাইপ নেমে গিয়ে ঢুকেছে ড্রেনের মধ্যে। ছড়া ভেসে আসছে এই ড্রেনের ভেতর থেকে। ছেলেটা যেন ড্রেনের মধ্যে বহাল তবিয়তে রয়েছে। একটার পর একটা ছড়া কেটে যাচ্ছে। স্তম্ভিত সকলেই। আচমকা স্তব্ধ হল কচিকণ্ঠ।

সুরেশ এগিয়ে গেলেন ড্রেনের দিকে—ঝুঁকে দেখবেন বলে। বাধা দিতে গেছিল মাধবী। তার আগেই...

ফোয়ারার মতন তেড়েফুঁড়ে কাদাজল ছিটকে এল ড্রেনের ভেতর থেকে।

ভিজিয়ে দিল সুরেশ সাইকিয়ার ইউনিফর্ম। দুর্গন্ধে ভরে গেল গোটা ঘর। তেলতেলে কালচে-বাদামি কাদা থেমে থেমে তেড়ে এল পর-পর তিনবার।

তারপর কচিকণ্ঠ একবার শুধু হেসে উঠল। বিদ্রুপহীন নির্মল হাসি। সব চুপ পরক্ষণেই।



শিবালয় শহর ভোরের আলোয় এখন শুচিস্নিগ্ধ। রাতের বিভীষিকার লেশমাত্র নেই আকাশে বাতাসে। আকাশ নির্মেঘ।

সিভিলিয়ান ডিফেন্স ইউনিট এসে গেছে শহরে। টেলিফোনে খবর পেয়ে রান্নাঘরের কাণ্ড দেখে মুহ্যমান সকলেই সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছেন।

কর্নেল ডিসুজার টিম এখনও দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা নেমে গেছে নিচের দিকে—সব্বার চোখ সেইদিকে।

একটু পরেই আবির্ভূত হল একটা বড় গাড়ি। হাঁপ-ধরা ইঞ্জিনের আওয়াজ বাড়তে লাগল একটু একটু করে।

রাস্তা বেয়ে যেন গুঁড়ি মেরে উঠে এল মোট তিনটে গাড়ি। সবার আগে রয়েছে ঝকঝকে সাদা মোবাইল হোম। ছত্রিশ ফুট লম্বা বিশাল দানব। দু'পাশে নেই কোনও দরজা বা জানলা। প্রবেশ পথ নিশ্চয় একটাই—যা রয়েছে পেছনে। বিশাল বেঁকানো উইন্ডশিল্ড কালচে রঙের—ভেতরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। দূর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, কাচ বেশ পুরু, সাধারণ মোবাইল হোমে যে রকম কাচ থাকে, তার চাইতে মোটা আর মজবুত।

দ্বিতীয় গাড়িটা রয়েছে এর পেছনে। তার পেছনে আসছে একটা ট্রাক—পেছনে টেনে আনছে তিরিশ ফুট লম্বা একটা ট্রেলার। ট্রাকের জানলার কাচও গাঢ় কালচে রঙের—বুলেট-প্রুফ নিশ্চয়।

রাস্তার মাঝে গিয়ে দাঁড়ালেন সুরেশ সাইকিয়া। দু'হাত মাথার উপর তুলে নেড়ে গেলেন—ড্রাইভারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

মোবাইল হোম আর ট্রাক নিশ্চয় মালপত্র বোঝাই—এত ভারী যে চড়াই রাস্তা বেয়ে উঠতে হাঁফ ধরে যাচ্ছে শক্তিশালী ইঞ্জিনগুলোর। ইঞ্জিনে কর্কশ শব্দ হচ্ছে। উঠছে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে, হোটেলের সামনে এসে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে আড়াআড়িভাবে রাখল মোড় ঘুরে পাশের রাস্তায়—যাতে গাড়ি গড়িয়ে নেমে না যায়। এখানকার রাস্তা সমতল, ঢালু নয়।

অতি-গরম ইঞ্জিন তিনটে বন্ধ করে দেওয়া হল একে একে।

মাধবীর মনে উল্লাস। বিশেষজ্ঞরা এসে গেছে, আর ভয় কী।

ট্রাকের পেছনের দরজা খুলে গেল প্রথমে। লাফিয়ে নেমে এল কয়েকজন পুরুষ। প্রত্যেকের পরনে এয়ারটাইট ভিনাইল স্যুট। মাথায় মস্ত হেলমেট—বড় সাইজের প্লেক্সিগ্লাস ফেসপ্লেট রয়েছে সামনে। নিজস্ব এয়ার সাপ্লাই ট্যাঙ্ক রয়েছে প্রত্যেকের পিঠে। আবর্জনা পরিশোধনের ব্রীফকেস সাইজের বাক্সও রয়েছে পিঠে।

ঠিক যেন মহাকাশচারীরা নামছে ট্রাক থেকে। ছ'জন চটপটে পুরুষ নামল পর পর। নামছে আরও। প্রত্যেকেই বিলক্ষণ সশস্ত্র। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ক্যারাভানের দু'পাশে, গাড়িগুলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে। বিজ্ঞানী নয় এরা। সৈন্যবাহিনী। হেলমেটের ওপর লেখা প্রত্যেকের নাম—ফেসপ্লেটের ঠিক ওপরে। অস্ত্র উঁচিয়ে রয়েছে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর দিকে।

এগিয়ে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'এটা কী হচ্ছে?'

ওঁর সামনেই দাঁড়িয়েছিল যে সার্জেন্ট, তার অস্ত্র তৎক্ষণাৎ টার্গেট করল আকাশকে। নিক্ষিপ্ত হল একটা বুলেট। আওয়াজে কেঁপে উঠল শিবালয় শহর।

থমকে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া। তার পাশের প্রহরীদের হাত চলে গেল কোমরের অস্ত্রের দিকে।

গুলিবর্ষণ শুরু হওয়ার আগেই গলার শির তুলে চেঁচিয়ে উঠলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'নো শুটিং!'

এগিয়ে এল একজন সোলজার। এর বুকে লাগানো একটা ছোট্ট রেডিয়ো অ্যামপ্লিফায়ার—লম্বায়-চওড়ায় ছ'ইঞ্চি। পিঁক পিঁক কণ্ঠস্বর বেরিয়ে এল অ্যামপ্লিফায়ার থেকে, 'দয়া করে গাড়ির কাছ থেকে সরে দাঁড়ান। ল্যাবরেটরির ক্ষতি যাতে না হয় আমাদের তা দেখতে হবে। যে আসবে, সে মরবে, সে যেই হোক।'

'আরে, আমিই তো ডেকে আনলাম তোমাদের।'

'পিছিয়ে যান,' সোলজারের জবাব একটাই।

এই সময়ে খুলে গেল প্রথম মোবাইল হোমের পেছনের দরজা। এয়ারটাইট পরিচ্ছদ পরে বেরিয়ে এল চার ব্যক্তি। কিন্তু তারা সোলজার নয়। এগিয়ে এল মন্থর চরণে। নিরস্ত্র প্রত্যেকেই। এদের একজন মহিলা। মাথার হেলমেটে লেখা নাম অপরাজিতা সোম।

দ্বিতীয় মোবাইল হোম থেকে নেমে দাঁড়াল ছ'জন পুরুষ।

মোট দশজন। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সোলজারদের পেছনে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিল ইন্টার স্যুট রেডিয়ো মারফত। প্লেক্সিগ্লাসের পেছনে তাদের ঠোঁট নড়ছে দেখা যাচ্ছে—কিন্তু কথা ভেসে আসছে না বাইরে। বুকের বাক্স নীরব। তার মানে, প্রাইভেট আলোচনা করতে পারে ইচ্ছে করলে, তখন পাবলিক শুনতে পাবে না তাদের কথা।

এই মুহূর্তে ওরা চাইছে ওদের কথা যেন কেউ শুনতে না পায়। কিন্তু কেন? অবাক হয় মাধবী। এত লুকোছাপার কী আছে?

কর্নেল ডিসুজা এগিয়ে এলেন ঠিক এই সময়ে। দশজনের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে লম্বা।

খেঁকিয়ে উঠলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'আগে জানতে চাই গান পয়েন্টে কেন রাখা হয়েছে আমাদের।'

'সরি,' নিরুত্তাপ স্বরে বললেন কর্নেল ডিসুজা। ঘুরে দাঁড়ালেন সোলজারদের দিকে, 'রেস্ট।'

নিমেষে সাবমেশিন কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গেল সৈনিক পুরুষরা।

বললেন কর্নেল ডিসুজা, 'মিঃ সাইকিয়া, অযথা রাগ করবেন না। আমরা রিসার্চ টিম। মড়কের কারণ অনুসন্ধান করতে এসেছি, চিকিৎসার সরঞ্জাম নিয়ে আসিনি। ছোঁয়াচে রোগ নিয়ে কেউ যদি আমাদের মধ্যে সংক্রমণ শুরু করে দেয়, এত আয়োজন মাঠে মারা যাবে। তাই এত হুঁশিয়ারি।'

'প্লেগের ভাইরাস পাছে আপনাদের মধ্যে চালান করে দিই, তাই তো এত ভয়?' এই প্রথম কথা বলল মাধবী।

বললেন কর্নেল ডিসুজা, 'আপনিই ডক্টর মাধবী লাহা? হ্যাঁ, ভয় সেইখানেই। ভাইরাসের প্রতিষেধক বের করার আগে নিজেরাই যদি সংক্রামিত হই তাহলে যে গোটা দেশটা ছারখার হয়ে যাবে। সময় নষ্ট করবেন না। কাল রাতে যা-যা বলেছেন, আগে সব দেখান। তারপর শুরু করব ময়না-তদন্ত। ডক্টর লাহা, শুধু আপনি চলুন মিঃ সাইকিয়ার সঙ্গে। ডেডবডি আগে দেখেছিলেন আপনি। এতক্ষণে যদি কিছু পালটে গিয়ে থাকে, ধরতে পারবেন আপনি। চলুন।'

আহার্য নিবাস। রান্নাঘরে তিলধারণের স্থান নেই। অস্বস্তির-মধ্যে রয়েছেন সুরেশ সাইকিয়া। অদৃশ্য শত্রুর আক্রমণ আচমকা আরম্ভ হয়ে গেলে বেরোতে পারবেন তো?

দুটো উনুনের মধ্যে বসানো মুণ্ডু দুটোকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে—রয়েছে ঠিক আগের অবস্থায়। কাউন্টারের ওপর কাটা হাত দুটো ধরে রয়েছে বেলুনটা।

কর্নেল ডিসুজার ফটোগ্রাফার শাটার টিপে যাচ্ছে ক্যামেরায়। নানান দিক থেকে তুলে রাখছে অবিশ্বাস্য দৃশ্যের ছবি। তারপর ডজনখানেক ছবি তুলল খুব কাছ থেকে। ফটোগ্রাফিক রেকর্ড শেষ হলেই শুরু হবে ফোরেন্সিক কাজকর্ম।

কর্নেল ডিসুজা বলে উঠলেন, 'মুজিব, তুমি তো নার্ভ গ্যাস স্পেশালিস্ট। দেখে কী মনে হচ্ছে?'

যাঁকে বললেন, তাঁর হেলমেটে লেখা রয়েছে পুরো নাম, মুজিব রহমান।

তিনি বললেন, 'জবাবটা এত তাড়াতাড়ি দেওয়া যাবে না। তবে বিষ গ্যাস প্রয়োগ করা হয়েছে বলেই মনে হয়। যে কোনও নার্ভ গ্যাস চামড়ার সংস্পর্শে এলেই তিরিশ সেকেন্ড থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে খতম করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।'

'কীভাবে?' প্রশ্নটা করলেন সুরেশ সাইকিয়া।

'চামড়ার মধ্যে দিয়ে ঢুকে মিশে যায় রক্তস্রোতে—দশ সেকেন্ডের মধ্যেই। চলে যায় ব্রেনে। সঙ্গে সঙ্গে জখম করে ব্রেনের টিস্যু। আর তার মেরামত হয় না। পাঁচ-ছ'ঘণ্টা হাত-পা নাড়ার পুরো ক্ষমতা থাকে, গায়ে শক্তিও থাকে। কিন্তু ভোগে মন।'

'ডিমেনসিয়া প্যারানয়েড,' বললেন কর্নেল ডিসুজা, 'বুদ্ধিশুদ্ধি গোলমাল হতে থাকে, আতঙ্ক আর ক্রোধ জাগে, ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখবার ক্ষমতা লোপ পায়। মনে হয়, প্রত্যেকেই বুঝি ষড়যন্ত্র করছে। খুনখারাপির ইচ্ছেটা তখন মাথাচাড়া দেয়। মন বলে কোনও বস্তু আর থাকে না, খুনের মেশিন হয়ে যায়। এই অবস্থা থাকে চার থেকে ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত। বিষ-আক্রান্ত ব্যক্তিরাই খুন করতে থাকে পরস্পরকে—যারা আক্রান্ত হয়নি, তাদেরও ছেড়ে দেয় না।'

'মিউটেশনগ্রস্ত জলাতঙ্ক-ও তো হতে পারে,' বললে মাধবী।

'নার্ভ গ্যাস সে জিনিস নয়,' জবাবটা দিলেন মুজিব। 'গ্যাস একবার ছড়িয়ে উড়ে গেলে, আর ভয় নেই। শরীরের যা ক্ষতি করে যায়, তা কল্পনা করাও কঠিন।'

'গ্যাস-ই যদি হয়, অনেক আগেই ছড়িয়ে উবে গেছে,' বললেন ডিসুজা, 'তবে সব কিছুর ওপরেই তার লেশ নিশ্চয় আছে। সেটাই পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

জিজ্ঞেস করলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'খুনখারাপির ইচ্ছেটা থাকে চার থেকে ছ'ঘণ্টা পর্যন্ত। তারপর কী হয়?'

‘তারপরের অবস্থাটা চলে ছয় থেকে বারো ঘণ্টা পর্যন্ত,’ বললেন কর্নেল ডিসুজা, ‘নার্ভের দফারফা হতে শুরু করে। প্যারালিসিস ছড়িয়ে পড়ে ব্রেনের বিশেষ সেন্টারেও।’

‘খুলে বলুন।’

‘শরীরের অটোমেটিক ফাংশানগুলোর ওপর ব্রেনের নিয়ন্ত্রণ একটু একটু করে কমে যেতে থাকে। নিঃশ্বাস আটকে যায়, হার্ট চলতে চায় না, রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বেচাল হয়ে যায়। ছয় ঘণ্টা থেকে বারো ঘণ্টা নারকীয় যন্ত্রণার মধ্যে থাকে আক্রান্ত ব্যক্তি—’

‘হার্ট বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চলে এই যন্ত্রণা?’

‘হ্যাঁ। বমি আর পায়খানাও লেগে থাকে।’

মাধবী বলে উঠল, ‘কিন্তু আমি যাদের মরতে দেখেছি, তাদের কেউ বমি বা পায়খানা করে মরেনি।’

‘বিশেষ জাতের নার্ভ গ্যাস বলেই নিশ্চয় তা হয়নি,’ জবাব দিলেন কর্নেল ডিসুজা।

‘তাহলে শচীনের অমন অবস্থা হল কেন?’

‘মথ-এর গল্প বলছেন?’ ডিসুজার স্বর একটু বেঁকা।

‘আগে সব দেখুন, তারপর মন্তব্য করবেন,’ মাধবীর স্বর এখন কঠিন। ‘তাহলে কাজ শুরু করা যাক,’ বলেই ইশারা করলেন ডিসুজা।

কাটা মুণ্ডু দুটোকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল পোর্সিলেন বালতিতে—এয়ারটাইট ডালায় পড়ল তালা। কাটা হাত দুটোকে রাখা হল আর একটা বালতিতে। একটু ময়দা চেঁছে ঢোকানো হলে ছোট্ট প্লাস্টিক শিশিতে। নার্ভ গ্যাস নিশ্চয় লেগে আছে শুকনো ময়দায়। ভ্যাকুম ক্লিনার দিয়ে উনুন দুটোর ভেতরের সবকিছু টেনে নিয়ে ঢোকানো হল দুটো প্লাস্টিক ব্যাগে।

আগাগোড়া একটা টেপরেকর্ডার চলতে লাগল কর্নেল ডিসুজার বেল্টে। বৈজ্ঞানিকরা কাজ করছে—যা করছে, তা মুখে মুখে বলে যাচ্ছে। সব টেপ রেকর্ডারে উঠে যাচ্ছে। দৈবাৎ যদি এই দল খতম হয়ে যায়, পরবর্তী দল যেন জানতে পারে আগের ঘটনা।

এরপর যাওয়া হল রোগাটে ধরনের সেই বাড়িটায় যার একতলায় রয়েছে ছবি আর গিফটের দোকান।

রান্নাঘরে রয়েছে সেই মৃতদেহটা। ফ্রিজ খুলে রেখে হেলে রয়েছে ফ্রিজের গায়ে। ফুলে ঢোল শরীর। প্যাটপেটে শূন্য চাহনি।

ডিসুজা হুকুম দিলেন, ময়না তদন্ত করার জন্যে এই লাশ নিয়ে যাওয়া হোক।

বিড়বিড় করে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘যে তদন্তই করুন না কেন, নার্ভ গ্যাসের সন্ধান পাবেন না। কোনও নার্ভ গ্যাসই শরীর ফুলিয়ে এরকম অবস্থা করে না।’

‘অ্যালার্জির জন্যেও হতে পারে। নার্ভ গ্যাসের অ্যালার্জি,’ কর্নেল ডিসুজা অম্লানবদনে এই কথা বলে ঢুকে গেলেন পাশের ঘরে, যে-ঘরে খাটে শুয়ে পয়েন্ট টু-টু অটোমেটিকে গুলিবর্ষণ করে গেছে পঁচিশ বছরের যুবক। আটটা গুলি লাগিয়েছে আততায়ীর গায়ে, অথচ রক্তপাত ঘটেনি।

বললেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘নার্ভ গ্যাস লক্ষ করে নিশ্চয় গুলিবর্ষণ করে যায়নি?’

‘গ্যাস নিশ্চয় ব্রেন বিগড়ে দিয়েছিল—দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল, ছায়াশরীর দেখেছে বিকল ব্রেনের কারসাজিতে। গুলি চালিয়েছে এলোপাতাড়ি।’

‘তাহলে আটটা কার্তুজ গেল কোথায়? ছায়াশরীরের গায়ে?’

‘আটখানা গুলি হজম করে হেঁটে বেরিয়ে যেতে পারে যে, সে কে কর্নেল ডিসুজা?’ মাধবীর স্বর এখনও কঠিন।

নিরুত্তর রইলেন কর্নেল। তাঁর সঙ্গীদের চোখে আতঙ্ক জাগছে একটু একটু করে। যুবকের মুখভাব অতিশয় বিকট—মরে গিয়েও ত্রাস বিকিরণ করে যাচ্ছে।

ফুলে ওঠা বডি দুটোকে প্লাস্টিক ব্যাগে ঢুকিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে গিয়ে সুরেশ সাইকিয়ার মুখে সব শুনলেন কর্নেল ডিসুজা।

বললেন, ‘আপনারা প্রত্যেকেই হ্যালিউসিনেশনে ভুগছেন। আগে আপনাদের পরীক্ষা করা দরকার।’

‘এতগুলো মানুষ কি একই সঙ্গে একই হ্যালিউসিনেশন দেখছে?’ মাধবী বললে কড়া গলায়।

‘ডাক্তার, মাস হলিউসিনেশন নতুন ব্যাপার কি?’

‘কয়েক সেকেন্ডে অন্ধকারে মধ্যে রমেশ থাপা অদৃশ্য হয়ে গেল কী করে?’ সুরেশ সাইকিয়ার প্রশ্ন।

‘পালিয়েছে। শহর ছেড়ে পালিয়েছে,’ কর্নেলের জবাব।

‘শচীনের অবস্থা অমন হল কেন? ডেডবডি উধাও হয়ে গেল কীভাবে?’ ‘মাস হ্যালিউসিনেশন।’

ঠিক এই সময়ে ঠক ঠক আওয়াজ শোনা গেল মাংস রাখার লকারের (কোল্ড স্টোরেজের) মধ্যে। ভেতরে থেকে কে যেন হাতুড়ি ঠুকে চলছে। সেই সঙ্গে শোনা গেল রমেশ থাপার কাতরানি, ‘উঃ! আর যে পারছি না! কী ঠান্ডা! কী ঠান্ডা! খুলুন—পাল্লাটা খুলুন।’

থ হয়ে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া। চোখের পাতা পড়ল না মাধবীর। কটমট করে চেয়ে রইলেন কর্নেল ডিসুজা।

বললেন, 'ভেতরে কে?'

জবাবটা এল লকারের ভেতর থেকেই, 'আমি... রমেশ থাপা।'

'ভেতরে ঢোকা হল কী করে?'

'আমিই লুকিয়ে পড়েছিলাম, আর বেরোতে পারছি না।'

'ঠান্ডায় তো এতক্ষণে মরে যাওয়া উচিত ছিল।'

'বরফ জমানোর ঠান্ডা তো নেই... উ... হু হু... খুলুন-না পাল্লাটা।'

চোখের ইঙ্গিত করলেন কর্নেল। এগিয়ে গেল দু'জন হেলমেট পরা সান্ত্রী। রুখে দাঁড়ালেন সুরেশ সাইকিয়া, 'খুলবেন না।'

'জ্যান্ত একটা লোককে মেরে ফেলতে চান?' কর্নেল এখন প্রকৃতই মিলিটারি রুক্ষতা দেখাচ্ছেন।

'কেউ নেই লকারে। গত রাতে আমি নিজে খুলে চেক আপ করেছি।'

'তাহলে রমেশ থাপা ভেতরে গেল কী করে?'

'ওটা রমেশ থাপা নয়।'

'ননসেন্স। খোলো পাল্লা!'

একজন সান্ত্রী সাবমেশিন গান উচিয়ে দাঁড়ালো পাল্লার এক পাশে, আর একজন এক হাতে অস্ত্র বাগিয়ে আর এক হাত রাখল পাল্লার হ্যান্ডেলে।

আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলেন না সুরেশ সাইকিয়া। চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্লীজ! প্লীজ! পাল্লা খুলবেন না।'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই কিন্তু পাল্লার হ্যান্ডেল আপনা থেকেই নেমে গেল নিচের দিকে। অথচ সান্ত্রীর হাতের চাপ তখনও পড়েনি হ্যান্ডেলে। নিমেষে খুলে গেল পাল্লা। লকলকে কালো বিদ্যুৎশিখার মতন কী যেন ফাঁক দিয়ে ঠিকরে এসে পাকসাট দিল সান্ত্রীকে। পলক ফেলার আগেই তাকে এক হ্যাঁচকা টানে সাবমেশিন গান সমেত টেনে নিয়ে গেল ভেতরে। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল পাল্লা।

প্রকৃতই হতভম্ভ হয়ে গেলেন কর্নেল ডিসুজা এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা। লকারের ভেতর থেকে ভেসে এল দুমদাম শব্দ। যেন ঠিকরে ঠিকরে গিয়ে লকারের গায়ে আছড়ে আছড়ে পড়ছে সান্ত্রীর দেহ। ভেতরটা তো অনেক বড়। আট ফুট বাই ন'ফুট। গুলিবর্ষণও চলছে অবিরাম। তারপর সব চুপ।

ঢোক গিললেন কর্নেল ডিসুজা। বিমূঢ় চোখে তাকালেন সুরেশ সাইকিয়ার দিকে। ভাবখানা, 'এখন কী করব?'

জবাব দিলেন সুরেশ শুষ্ককণ্ঠে, 'সব ক'টা সাবমেশিনগান তাক করুন, তারপর পাল্লা খুলুন। সাবধান, এরপর কী ঘটতে পারে, আমার জানা নেই।'

ফের ঢোক গিললেন কর্নেল। কাজ হল অবশ্য সুরেশ সাইকিয়ার নির্দেশ মতোই। খোলা হল পাল্লা। ভেতরে জ্বলছে আলো। ছাদ থেকে ঝুলছে সান্ত্রীর দেহ—মাংস গেঁথে রাখার আঁকশি দিয়ে গাঁথা হয়েছে তার দেহ।

কিন্তু ঝুলছে শুধু তার কঙ্কাল। কঙ্কাল পরে আছে হেলমেট আর বিচিত্র পোশাক। এমনকী পায়ের মজবুত বিশেষ বুটজুতোও।

লকারের মেঝেতে পড়ে নেই একফোঁটা রক্ত! খালি কার্তুজের কিছু খোল গড়াগড়ি যাচ্ছে মেঝেতে। সীসের বুলেট কিন্তু পড়ে নেই কোথাও। যার দিকে ছোঁড়া হয়েছে গুলি, যেন তার গায়ে লেগেছে এবং স্রেফ হজম করেছে।

চকচকে খোলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'ক'টা গুলি ছিল অতবড় ম্যাগাজিনে? দু'শো?'

চোখ বড় বড় করে খালি খোলগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন কর্নেল ডিসুজা। কথা বললেন না।

বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'খামোকা সময় নষ্ট করছেন। এটা নার্ভ গ্যাসের কেস নয়। আপনাকে সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্যে আপনারই লোককে খতম করা হল তিল তিল করে। তাকে নিমেষে শেষ করে দিতে পারত, ভ্যানিশ করেও দিতে পারত। কিন্তু চোখে না দেখলে আর কানে না শুনলে তো আপনার বিশ্বাস হবে না। তাই গুলি ছোঁড়ার সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছে, গুলিবর্ষণের শব্দও আপনাকে শোনানো হয়েছে। তারপরেই দেহ চাঁছাপোছা হয়ে গেল কী করে? কোন ম্যাজিকে? সীসের গুলিগুলো গেল কার গায়ে? কর্নেল ডিসুজা, নার্ভ গ্যাস নয়, অপদেবতাও নয়, আরও ভয়ংকর অশ্রুতপূর্ব কিছুর রাজত্ব শুরু হয়েছে শিবালয় শহরে। তাদের হাতে আমরা খেলনার পুতুল ছাড়া আর কিছু নই।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কর্নেল বললেন, 'কিন্তু রমেশ থাপার গলা তো আপনি চিনতে পেরেছিলেন?'

'গলা নকল করা হয়েছে, যেমন টেলিফোনে শচীনের গলা শুনেছেন ডক্টর লাহা। জন্তু-জানোয়ারদের গলাবাজিও পুরো নকল।'

'তাহলে তো বলব অতিপ্রাকৃত ব্যাপার।'

'আমি বলব ঠিক উলটো, একেবারে প্রাকৃতিক বাস্তব ঘটনা।'

'তাহলে বলুন সেটা কী?'

‘জানলে তো বলব?’ তেতো হয়ে গেল সুরেশ সাইকিয়ার গলা। ‘জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরি থেকে হয়তো কোনও ন্যাচারাল মিউটেশন বেরিয়ে পড়েছে। কিছু জানোয়ারের ডিএনএ থেকে এমন দানব বানিয়েছে যারা ভূতের মতন অদৃশ্য থেকে গোটা আর্মি নিকেশ করে দিতে পারে—বাতাসে মিলিয়ে দিতেও পারে। টারানটুলা আর কুমির, ভিমরুল আর বাঘ—এদের ডিএনএ স্ট্রাকচার মিলিয়ে মিশিয়ে একটা কল্পনাতীত সত্তা বানিয়ে তার মধ্যে মানুষের বুদ্ধি হয়তো ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কী ভাবছেন, আমি পাগল হয়ে গেছি? ডক্টর ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের আধুনিক সংস্করণ দেখছেন মনে হচ্ছে? ডিএনএ রিসার্চ কদ্দূর গড়িয়েছে, সে খবর আপনিও তো রাখেন কর্নেল। এক কথায় তাই বলব, এমন এক অজানা শক্তির সঙ্গে মহড়া দিতে নেমেছি, যে শক্তি আমাদের যাবতীয় দুঃস্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিতে পারে।’

ঢোক গিলে বললেন কর্নেল ডিসুজা, ‘প্রথমে ডেডবডিটার ময়না তদন্ত তো করা যাক—’

‘ঝটপট করুন,’ বললে মাধবী, ‘সময় ফুরিয়ে আসছে।’

লকারের মধ্যে যে ব্যক্তি নিমেষে কঙ্কালে পরিণত হল, তার নাম সার্জেন্ট জোশী।

এখন যাকে ম্যানহোল দিয়ে রাস্তার তলার পাইপে নামানো হল, তার নাম করপোরাল রহমান। লোহার মই নেমে গেছে নিচ পর্যন্ত। পাইপ কিন্তু শুকনো, জল যায় না এখান দিয়ে, জলের ড্রেন-পাইপ আলাদা।

এ পাইপ দিয়ে গেছে ইলেকট্রিকের গোছা গোছা তার। আধুনিক শহর। টেলিফোন, ল্যাম্পপোস্ট অথবা বাড়ির ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের তার শূন্যে ঝোলে না—সবই রাস্তার তলা দিয়ে, এই পাইপের মধ্যে দিয়ে।

শুকনো খটখটে পাইপে মাথা সিধে করে দাঁড়ানো যায় না, কর্পোরাল রহমানকেও দাঁড়াতে হল সেইভাবে। মাথার মধ্যে ঘুরছে কিন্তু সেই দুশ্চিন্তা। সার্জেন্ট জোশী অত গুলি চালিয়েও আচমকা কঙ্কাল হয়ে গেল কী করে?

কংক্রিট মেঝেতে দাঁড়িয়ে টর্চ জ্বেলে চারিদিক দেখে নিল রহমান। একটু ভিজে ভিজে ভাব। দেওয়ালে ছাতা ধরেছে। তারের গোছা পাতা রয়েছে পলিথিন পাইপের মধ্যে দিয়ে।

সিঁড়ির তলা থেকে সরে এল রহমান। সিঁড়ি বেয়ে এখন নামছে আব্দুল করিম। কর্নেল ডিসুজার আর এক ডাকাবুকো স্যাঙাৎ। কংক্রিট মেঝেতে পা দিতেই রহমান টর্চের আলোয় তাকে দেখিয়ে দিল ভয়ের কিছু নেই পাতাল-সুড়ঙ্গে।

বুক কাঁপছে কিন্তু আবদুলেরও। সার্জেন্ট জোশীর কঙ্কাল কলেবর সে-ও দেখেছে।

ইলেকট্রিক কেবল নেমে এল ওপর থেকে। এই কেবল টেনে নিয়ে গিয়ে নামিয়ে দিতে হবে ইলেকট্রিক জাংশন বক্সে—যা রয়েছে একটু দূরে শিবালয় সড়কের তলার টানেলের ক্রশিংয়ে।

দু'পাশে টর্চ ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছে দুই জওয়ান। কিম্ভূত পোশাক তাদের চলায় মন্থরতা এনে দিচ্ছে। টর্চের ফোকাস যতদূর যায়—ভয় পাওয়ার মতন কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না।

এসে গেছে ইলেকট্রিক জাংশন বক্স। শিবালয় সড়কের নিচের সুড়ঙ্গ কিন্তু সমান্তরাল নয়। নিচের দিক থেকে উঠে গেছে ওপর দিকে। যেন নরক থেকে উঠছে স্বর্গে।

খসখস... খসখস... খড়মড় খড়মড় আওয়াজটা শোনা গেল ঠিক তখনই। গুরুভার ডেকন স্যুট পরে শব্দের দিকে তাকিয়ে এবং টর্চ মেরেই থ হয়ে গেল দুজনেই!

পালে পালে জন্তু উল্কাবেগে ধেয়ে আসছে শিবালয় সড়কের পাতালের দিক থেকে! খসখস খড়মড় আওয়াজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাদের ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ের দরুন ঘনঘন শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ। এ ছাড়া আর কোনও আওয়াজ নেই। কারও কণ্ঠ চিরে ঠিকরে আসছে না পাশবিক গজরানি।

তারা ধেয়ে আসছে নক্ষত্রবেগে ক্রশিংয়ের দিকে। প্রত্যেকেই সোজা চেয়ে রয়েছে সামনে... টানেল যেখানে ওপর দিকে উঠে গেছে সেইদিকে। কারোরই চাহনি নিবদ্ধ নয় দুই আগন্তুকের ওপর।

ওরা সরে এল পেছনের টানেলে—যে টানেল দিয়ে এসেছে সেইখানে।

নিমেষে ক্রশিং পেরিয়ে গেল ধাবমান পশুবাহিনী। শ'য়ে শ'য়ে পশু। ধেয়ে আসছে স্রোতের আকারে, রকমারি কুকুর বেড়াল—কিন্তু ঘেউ ঘেউ অথবা মিউ মিউ করছে না। আসছে কাঠবেড়ালি, খরগোশ। শিয়াল আর বেজি। ইঁদুর আর ছুঁচো। নেকড়ে আর বুনো বেড়াল।

রেডিয়োতে খবরটা দিয়ে দিল রহমান কর্নেল ডিসুজাকে। বললে, 'পশুনদী দেখছি যেন, কিন্তু তেড়ে আসছে না। পাগলের মতন ছুটছে টানেলের ওপর দিকে।'

বলা শেষ হতে না হতেই এসে গেল সাপ। হাজারে হাজারে সাপ। জন্তুদের পাশে পাশে ধেয়ে আসছে। লম্বা কালো সাপ থেকে খুদে সবজেটে সাপ—সর্প বাহিনীর সব প্রজাতি হাজির এই প্রতিযোগিতায়।

কোনও সাপই দেখছে না দুই আগন্তককে। তাদের শীতল চাহনি নিবদ্ধ সামনের দিকে—সুড়ঙ্গ যেদিকে একটু একটু করে উঠে গেছে ওপর দিকে—সেইদিকে।

রক্ত-জল করা হুঙ্কারটা আচম্বিতে ভেসে এল সেইদিক থেকেই।

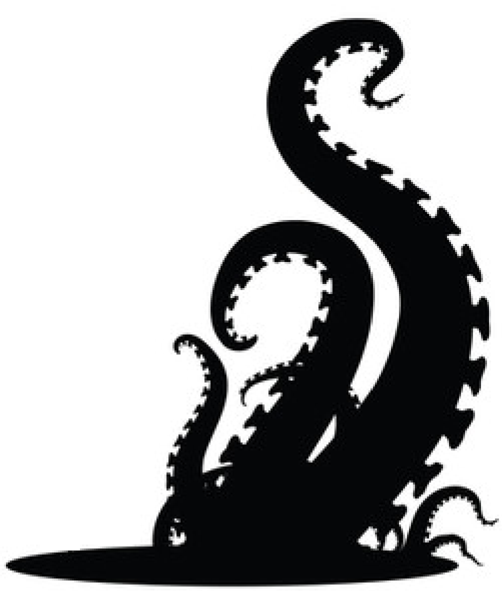
মানুষের আর্তনাদ তাকে বলা যায় না, পাশবিক গজরানিও নয়। অথচ তা নিঃসৃত হচ্ছে সজীব কোনও কণ্ঠ চিরে। রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছে সেই চিৎকারে। অথচ তার মধ্যে নেই আতঙ্ক অথবা যন্ত্রণা। ক্রোধ, ঘৃণা আর রক্ততৃষ্ণা ফেটে পড়ছে অমানবিক, অপাশবিক সেই বিকট নিনাদের মধ্যে।

লোম-খাড়া করা সেই চিৎকারের উৎস কাছাকাছি কোথাও নয়। অনেক দূর থেকে —পাহাড়ের ওপর দিক থেকে কল্পনাতীত সেই চিৎকার অন্তরের সমস্ত বিদ্বেষ, বিতৃষ্ণা, আক্রোশ উজাড় করে দিচ্ছে—এক-একটা ভয়াল হুঙ্কারের মধ্যে দিয়ে। সে কিন্তু থেমে নেই এক জায়গায়। বিপুল বেগে ধেয়ে আসছে এই দিকেই। তাই মুহুর্মুহু সুড়ঙ্গ প্রকম্পিত হচ্ছে, উচ্চ থেকে উচ্চতর মাত্রায়। দ্রুত, অতিদ্রুত লোমহর্ষক নিনাদের স্রষ্টা নিকটবর্তী হয়েই চলেছে। কানের মধ্যে দিয়ে যেন গোছ গোছ শলাকা ব্রেনের মধ্যে গেঁথে গেঁথে যাচ্ছে—অসাড় করে তুলছে মস্তিষ্ককে। একটু পরেই শোনা গেল গুরুভার শরীরের পদধ্বনি। ধুপধাপ আওয়াজে কাঁপছে সুড়ঙ্গ। অথচ মন্থর সে নয় মোটেই, বিপুলাকার কলেবরকে উড়িয়ে নিয়ে আসছে বিদ্যুৎসম গতিবেগে।

রহমান আর আবদুলের দুজনেরই মনে হল, স্বয়ং শয়তানও বুঝি এমন অপার্থিব হুঙ্কার সৃষ্টি করতে পারবে না সমগ্র শয়তানি বিদ্বেষ উজাড় করে দিয়েও। সুতরাং আর দেরি করা যায় না।

রহমান আগে ছুটল লোহার সিঁড়ির দিকে। জবরজং পোশাক নিয়ে লম্বা লাফ তো দেওয়া যাচ্ছে না। পেছনে আগুয়ান পাতাল-কাঁপানো পদধ্বনি আর কণ্ঠনিঃসৃত হুঙ্কার শুনতে শুনতে মইয়ের সামনে পৌঁছেই আগে উঠে গেল নিজে। পেছনে খানিকটা উঠেই পা পিছলে পড়ে যাচ্ছিল আবদুল, হাত বাড়িয়ে তার হাত খামচে ধরল রহমান। কিন্তু ধরে রাখতে পারল না...

হ্যাঁচকা টানে আবদুল করিম ছিটকে গেল মই থেকে টানেলের অন্ধকারে। অন্ধকারের আতঙ্ক তার নাগাল ধরে ফেলেছে...



রেডিয়ো মারফত আবদুল কিন্তু জানিয়ে গেছিল কার খপ্পরে সে পড়েছে।

খোলা ম্যানহোল থেকে যেটুকু আলো আসছিল, সেই আলোতে বিকট বিভীষিকাকে দেখা গেছিল পলকের জন্যে। তারপরেই নিবিড় তিমিরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করা হয়েছিল তার পোশাক—উরু আর পেটে কামড় বসানো হয়েছিল সবার আগে।

কিন্তু তার যে বর্ণনা মরতে মরতে দিয়ে গেছিল আবদুল করিম, তা যে বিশ্বাসের একদম বাইরে।

তার চেহারার অতি সামান্যই দেখেছিল আবদুল। গিরগিটির মতন অথচ গিরগিটি নয়, অতিকায় পোকা-ও নয়। অর্থাৎ পোকার আদল আছে কিম্ভূত অবয়বে, পলকের জন্যে চোখে পড়েছিল ক্ষুরের মতন ধারালো দু'সারি বল্লম সাজানো তার পিঠে। দেখেছিল বিরাট থাবা, নখগুলো তীক্ষাগ্র আঁকশির মতন। চোখ তার ধোঁয়াটে লালচে, লম্বাটে কণীনিকা কবরের মতন নিশ্চল নিথর। গায়ে তার চামড়া নেই, আছে আঁশ। মাথায় একজোড়া শিং ঠেলে উঠছে নরকাগ্নি ঠাসা চোখ জোড়ার ঠিক ওপর থেকে। বাঁকানো শিং—ভোজালি বললেই চলে। চোয়াল কুমিরের চোয়ালের মতন। চেরা জিব লকলকিয়ে পিছলে যাচ্ছে সারিবদ্ধ ছোরার মতন দংষ্ট্রার ওপর দিয়ে।

সুড়ঙ্গের অন্ধকারে আবদুলকে টেনে নিয়ে গিয়ে যখন উন্মাদের মতন অর্থহীন অট্টহাসি হাসছে তিমিরাবৃত সেই বিভীষিকা আর টুকরো টুকরো করছে আবদুলের

পোশাক, তখনও কর্তব্য করে গেছিল মানুষটা। যথাযথ বর্ণনা দিয়ে গেছিল আকুল কণ্ঠে। তারপর আর বার্তা ভেসে আসেনি রেডিয়ো মারফত। সব শেষ হয়ে গেছিল।

ম্যানহোলের ঢাকনা টেনে এনে বন্ধ করে দিয়েছিলেন কর্নেল ডিসুজা নিজে। তখন তিনি ঘামছেন।

ইতিমধ্যে বিরামবিহীন পরীক্ষানিরীক্ষা চলছিল মোবাইল ফিল্ড ল্যাবরেটরি দুটোয়। সব নমুনা টেস্ট করা হয়েছে। সন্দেহজনক কিসসু পাওয়া যায়নি। এমনকী যে-জল থই থই করছিল মেঝেতে, উজাগর সিং যার নমুনা এনেছিলেন শিশিতে সেই জলও আলট্রা-পিওর! আশ্চর্য ব্যাপার! গ্যালন গ্যালন আলট্রা-পিওর জল কে ঢেলে দিয়ে গেল শিবালয় শহরে?

শব ব্যবচ্ছেদও শেষ হয়েছে। নার্ভ গ্যাস অথবা জীবাণুর সন্ধান পাওয়া যায়নি। অজানা কোনও রসায়নের চিহ্নও নেই কোথাও।

বৈজ্ঞানিক অপরাজিতা সোম ব্যাকটিরিয়া কালচার তৈরি করছিলেন মোবাইল ল্যাবোরেটরিতে বসে। নিহত ব্যাক্তির রক্ত থেকে নমুনা নিয়ে চলছে পরীক্ষানিরীক্ষা, ইনি পেশায় বংশাণুবিদ। জিন উপাদানের পুনর্মিলন নিয়ে বারো বছর গবেষণা করেছেন। মানুষের হাতে গড়া অণুজীব শিবালয় শহরে অনর্থ সৃষ্টি করে চলেছে—এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেই তাঁর কাজ সোজা হয়ে যাবে।

তবে এইমাত্র যে খবর তাঁর কানে এসেছে, তা শোনবার পর তাঁর মনে হচ্ছে, পিশাচগুরুদের নয়া এক্সপেরিমেন্ট চলছে নাকি নির্জন শহরে?

মাধবী বসে আছে তাঁর পাশে।

কর্নেল ডিসুজা জিজ্ঞেস করলেন সুরেশ সাইকিয়াকে, ‘এমন কোনও বিস্ফোরণ সম্প্রতি ঘটেছিল যার কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না?’

‘বিস্ফোরণ?’

‘সুনাদী বিস্ফোরণ?’

‘তার মানে?’

‘সোনিক বুম।’

‘না।’

‘অস্বাভাবিক জোর কোনও আওয়াজ?’

‘না, না, না,’ ধোঁকায় পড়েছেন সুরেশ সাইকিয়া। কোন সিদ্ধান্ত নিতে চলেছেন কর্নেল, তা আন্দাজ করতে পারছেন না।

বলে চলেছেন কর্নেল, ‘অস্বাভাবিক কোনও উড়োজাহাজের খবর পেয়েছিলেন ধারেকাছে?’

'না।' একটু থেমে পাল্টা প্রশ্ন করলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'আপনি কি ফ্লাইং সসারের কথা ভাবছেন?'

'ফ্লাইং সসার বলতে লোকে ধরে নিয়েছে, আকাশ থেকে অদ্ভুত একটা স্পেসশিপ এসে নামল বুঝি পৃথিবীতে। মানুষের সঙ্গে অন্য গ্রহের উন্নত জীবদের অন্যরকমভাবে যোগাযোগেও তো ঘটতে পারে?'

'আপনার কথায় হেঁয়ালি স্পষ্ট হল না। তবে, ফ্লাইং সসার জাতীয় কোনও আজব মহাকাশযান কখনও আশেপাশে দেখা যায়নি।'

একটু থেমে বললেন কর্নেল, 'অন্য গ্রহের অতি উন্নত জীব এক্কেবারে অন্য রকমও তো হতে পারে।'

'মানে?'

'টেলিপ্যাথিতে অসাধারণ ক্ষমতা রাখে। আমরা যে-সব ঘটনাকে ভুতুড়ে কাণ্ড বলে উড়িয়ে দিই—তাদের পেছনেও এই টেলিপ্যাথিক যোগাযোগের চেষ্টা থাকতে পারে। যেমন, ঘরের ফার্নির্চারের আচমকা শূন্যে ভেসে ওঠা, জিনিসপত্রর শূন্যে ছিটকে যাওয়া, দেওয়ালের গা ফুঁড়ে তোড়ে জল বেরিয়ে আসা—অথচ সেখানে নেই কোনও জলের পাইপ, আগুনের গোলার শূন্যে ছুটোছুটি...'

'আপনি ভূত মানেন?'

'না। কিন্তু টেলিপ্যাথি দিয়ে পাঠানো চিন্তাধারায় বিশ্বাস রাখি। সাইকিক এনার্জিকে ঠিকমতো গ্রহণ করতে না পারলে তা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে।'

'শিবালয় শহরে এই রকম কিছু একটা ঘটেছে বলে আপনার বিশ্বাস?'

'জৈবিক দূষণ তো ঘটতে পারে... ভিনগ্রহীর সঙ্গে পৃথিবীগ্রহীর প্রথম ছোঁয়াছুঁয়ির সংস্পর্শ দোষ। হয়তো মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়েছে।'

'তাহলে সেই উন্নত ভিনগ্রহীকে পিশাচ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।'

'ভিনগ্রহী হলেই যে পরোপকারী দেবতাবিশেষ হতেই হবে, এমন কোনও গ্যারান্টি আছে কি? গরিলা পরে মানুষ হয়েছে। কিন্তু গরিলারা মানুষের মতন এমন যুদ্ধপাগল নয়।'

চুপ মেরে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া।



আকণ্ঠ ঠাসা প্রাতরাশ খেয়ে কুপোকাৎ হয়ে পড়েছিলেন ডক্টর উতঙ্ক চৌধুরী। দু'জন ছাত্র পড়তে এসেছিল তাঁর দু'ঘরের ফ্ল্যাটে। যত না পড়িয়েছেন, তার চেয়ে বেশি ঢুলেছেন। দুপুরের খাবার বাদ দিয়েছেন। বিকেল নাগাদ ভাবলেন এক কাপ চা তৈরি করে খাওয়া যাক, এমন সময়ে বেজে উঠল টেলিফোন।

ভুজঙ্গ বোনার্জীর ফোন, 'ডক্টর চৌধুরী, এখুনি আসছি, সুটকেস গুছিয়ে নিন।'

'কোথায় যাব?'

'শিবালয় শহরে।'

'সেটা কোথায়?'

'গেলেই দেখতে পাবেন। হিমালয়ের কোলে। সেখানে 'আদিম শত্রু'র আবির্ভাব ঘটেছে।'

'কী বলছেন?'

'জোর তদন্ত চলছে। কেউ হালে পানি পাচ্ছে না। কেউ বলছে নার্ভ গ্যাস, কেউ বলছে অণুজীবের মহামারী, কেউ বলছে ভিনগ্রহীরা পৈশাচিক কাণ্ড শুরু করে দিয়েছে।'

'পৈ... পৈশাচিক কাণ্ড!'

'গোটা শহরের মানুষ আর পশুপাখি রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে। কেউ কেউ ফুলে ঢোল হয়ে পড়েছে, কারও কাটা মুণ্ডু আর কাটা হাত শুধু রয়েছে। একজন

ভ্যানিশ হয়ে যাওয়ার আগে আপনার নাম আর আপনার লেখা বইয়ের নাম লিখে রেখে গেছে। বইটা বোধহয় ভদ্রলোকের পড়া ছিল। তিনিই ধরতে পেরেছিলেন, আদিম শত্রু ফের হানা দিয়েছে। তদন্তকারীরা কিন্তু এখনও ধরতে পারেনি কাণ্ডটা ঘটিয়েছে কারা, তারা কী ধরনের বিভীষিকা। ডক্টর চৌধুরী, তাই আপনার এখুনি সেখানে যাওয়া দরকার।

'আমি গিয়ে কী করব?'

'আদিম শত্রু নিয়ে সাধারণের উপযোগী ভাষায় লিখতে বলে দিয়েছি আপনাকে। লেখা শুরু করেছেন?'

'আর লেখা! সকালের খাবারই হজম হয়নি এখনও।'

'রাস্তায় বেরলেই হজম হয়ে যাবে। শুনুন। শিবালয় শহরে যা দেখবেন, যা শুনবেন, তা আপনার আগামী বইয়ের চেহারা পালটে দেবে। গোটা পৃথিবীতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছাড়বে আপনার 'আদিম শত্রু'র নয়া সংস্করণ। তৈরি হয়ে নিন। পনেরো মিনিট পরেই ট্যাক্সি নিয়ে আসছি। যাবো সোজা এয়ারপোর্টে। আপনার জন্যে শিলিগুড়ির প্লেনে একটা সিট বুক করে রেখেছি।'

'প্লেনে যাব!'

'খরচ যোগাবে আপনার নতুন পাবলিশার। এয়ারপোর্টে আপনাকে ঘিরে ধরবে রিপোর্টাররা। তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনি যা জানেন, তা বলে যাবেন।'

'প্রেস কনফারেন্স!'

'আজ্ঞে। আজ সকালে যে সব কাহিনি আমাকে শুনিয়েছেন, সব বলে যাবেন। মায়াদের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, তিন হাজার চীনে সৈন্যর অন্তর্ধান। আরও কিছু ঘটনা —যদি মনে পড়ে। পড়ছে কি?'

'অজস্র।'

'যেমন?'

'আমেরিকার প্রথম ব্রিটিশ কলোনি ভ্যানিশ হয়ে গেছিল রাতারাতি। রোয়ানোক আইল্যান্ড কলোনি।'

'অবশ্যই সেটা বলবেন।'

'কিন্তু আদিম শত্রুর কারসাজি ছিল তার পেছনে, সেরকম কোনও প্রমাণ তো নেই।'

'ব্যাপারটা কী?'

'১৫৯০-এর মার্চ মাসে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের টাকায় একটা ব্রিটিশ অভিযাত্রী দল রোয়ানোক আইল্যান্ডে ফিরে এসে দেখেছিল দ্বীপে কোনও প্রাণী নেই, মানুষও নেই, অথচ সবই ছিল আগে। কয়েকশো থিয়োরি হাজির করা হয়েছে, কিন্তু তা দিয়ে

অবিশ্বাস্যভাবে সমস্ত মানুষ আর মনুষ্যেতর প্রাণীর উধাও হয়ে যাওয়ার কোনও ব্যাখ্যা বের করা যায়নি। যেমন ধরুন, রোয়ানোক আইল্যান্ডের খুব কাছেই থাকে ক্রোয়ানটোয়ান ইন্ডিয়ানরা—এরাই এই কাণ্ড ঘটিয়েছে। একটা গাছের গুঁড়িতে খুব দ্রুত ক্রোয়ানটোয়ান শব্দটা লিখে গেছিল রোয়ানোক আইল্যান্ডের কোনও এক ব্যক্তি, কিন্তু দিব্যি গেলে বলেছে ক্রোয়ানটোয়ানরা, এ-ব্যাপারে তাদের কোনও হাত নেই, কিছু জানেও না। তারা শান্তিপ্রিয় মানুষ। রোয়ানোক আইল্যান্ডে উপনিবেশ গড়তে তারা যথেষ্ট সাহায্য করেছে। সেই উপনিবেশ ধ্বংস করতে যাবে কেন? ক্রোয়ানটোয়ানরা সত্যিই যুদ্ধবাজ জাত নয়, তাদের কথা বিশ্বাস করা যায়। তা ছাড়া, গোটা আইল্যান্ডে কোথাও লড়াই-টড়াইয়ের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কারও ডেডবডিও পাওয়া যায়নি। হাড় পর্যন্ত নেই। নেই কোনও কবর।'

'তাহলে 'ক্রোয়ানটোয়ান' নামটা গাছের ছালে খোদাই করা হল কেন?' ভুজঙ্গ বোনার্জীর প্রশ্ন।

'ক্রোয়ানটোয়ানরা নিশ্চয় জানে কারা এমন কাণ্ড ঘটাতে পারে। হয়তো তা নিছক কুসংস্কার। তবে ক্রোয়ানটোয়ানরা নিজেরাও লক্ষ করেছে, বোয়ানোক দ্বীপবাসীরা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের যে সব জঙ্গলে শিকার করতে যেত ক্রোয়ানটোয়ান শিকারীরা, সে সব জঙ্গল প্রাণীশূন্য হয়ে গেছে এক্কেবারে।'

'কুসংস্কারটা কী জাতীয়?'

'ওদের বিশ্বাস, সমস্ত অশুভ শক্তির মূল যে অশুভ শক্তি, যে-শক্তি কিছুই না অথচ সব কিছু হতে পারে, এ হল সেই শক্তির লীলা।'

'প্রেতবিশ্বাসীরা অবশ্য এরকম কথা বলে।'

'রোয়ানোক আইল্যান্ডের সব্বাইকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে এই শক্তি—ক্রোয়ানটোয়ানদের বিশ্বাস।'

'প্রেস কনফারেন্সে সব বলবেন। আমেরিকা একটা আশ্চর্য দেশ। সেখানে হইচই তুলতে পারলে আপনার বই মার-মার কাটকাট করে বেরিয়ে যাবে। তৈরি হয়ে নিন।'

এদিকে বৈজ্ঞানিকদের নিয়ে শহর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন সুরেশ সাইকিয়া। দেখাচ্ছেন অদ্ভুত অসম্ভব দৃশ্যের পর দৃশ্য। কোথাও গাড়ি টাল খেয়ে রাস্তা থেকে ছিটকে গেছে। সব ক'টা জানলার কাচ তোলা। দরজাগুলোও ভেতর থেকে লক করা। অথচ গাড়ি যে চালাচ্ছে, সে মরে গিয়ে ফুলে ঢোল হয়ে আটকে রয়েছে স্টিয়ারিং আর সিটের ফাঁকে। কোথাও একটা গাড়ি আর একটা গাড়িকে ওভারটেক করতে গিয়ে সংঘর্ষ ঘটিয়ে গায়ে গা লাগিয়ে ব্রেক কষেছে রাস্তার ওপরেই। দুটো

গাড়িরই সব কাচ তোলা, দরজাগুলো ভেতর থেকে লক করা, চালকরা কিন্তু মরে ঢোল।

কর্নেল ডিসুজা ইউটিলিটি বেল্ট থেকে ছোট্ট গাইগার কাউন্টার বের করে শেষের দুটো গাড়িকে পরখ করলেন। বিকিরণের লক্ষণ পেলেন না। চালকেরা বিকিরণের ফলে মারা যায়নি।

সুরেশ সাইকিয়া বললেন, 'দেখে তো মনে হচ্ছে, গাড়ি নিয়ে অনেকেই পালাতে গেছিল শহর ছেড়ে। বিষ গ্যাসের ভয়ে সব কাচ তুলে দিয়েও রেহাই পায়নি।'

'কার ভয়ে?' মাধবীর প্রশ্ন।

ডিসুজা নীরব।

মাধবী সঙ্গে এসেছে শহরের রাস্তাঘাট তার চেনা বলে। একটা বাড়ির সামনের দরজা দু'হাট খোলা দেখে এগিয়ে গেল নিজেই। থমকে গেল দোরগোড়ায়। হাতছানি দিয়ে ডাকল কর্নেলকে। তিনি কাছে আসতেই বললে, 'রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার। দেখুন কী অবস্থা করেছেন নিজের।'

উঁকি দিয়ে দেখলেন ডিসুজা। থ হয়ে গেলেন।

নিজের অটোমেটিক মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে গুলি চালিয়ে দিয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। কিন্তু কীসের ভয়ে?

পাশের বাড়ির বসবার ঘরে আর একটা দৃশ্য। সাদা দেওয়ালে আয়োডিন দিয়ে লেখা হয়েছে P R O। শেষ অক্ষরটার আধখানা লিখেই প্রাণ বেরিয়ে গেছে মেমসাহেব লেখিকার। প্রৌঢ়া। লুটিয়ে রয়েছে মেঝেতে।

বুলেট।

দু'খানা বাড়ির পরের বাড়িটা মাধবীর বান্ধবীর বাড়ি। বাড়ি ফাঁকা। কিন্তু রান্নাঘরের মেঝেতে শুধু বুলেট আর বুলেট। পুরো কার্তুজ নয়। শুধু সিসে। পেতলের খোল বাদ দিয়ে।

যেহেতু পেতলের খোল নেই ঘরের মধ্যে, অতএব বন্দুকের লড়াই হয়নি ওখানে। গান পাউডারের গন্ধও নেই। দেওয়ালে বা ক্যাবিনেটে বুলেটের গর্তও নেই।

শুধু বুলেট। যাদুমন্ত্রবলে যেন খসে পড়েছে হাওয়া থেকে।

এক মুঠো বুলেট তুলে নিয়েছিলেন সুরেশ সাইকিয়া। কোনও বুলেটই দুমড়ে থেঁতলে ফেটে যায়নি। আরও দেখলেন, রকমারি আগ্নেয়াস্ত্রর বুলেট ছড়িয়ে মেঝেতে,

একটা বিশেষ আগ্নেয়াস্ত্রের নয়। বেশির ভাগই সাবমেশিনগানের বুলেট। যে টাইপের বুলেট আর সাবমেশিনগান রয়েছে কর্নেল ডিসুজার রক্ষীবাহিনীর কাছে।

সার্জেন্ট যোশীর সাবমেশিনগানের বুলেট নয় তো? লকারের মধ্যে ঢুকে বেধড়ক গুলি চালিয়েছিল। মেঝেতে শুধু খালি খোল পড়ে থাকতে দেখা গেছে। সিসের গুলি পাওয়া যায়নি একটাও। যাকে টিপ করে গুলি চালিয়েছিল সার্জেন্ট যোশী, সে কি সিসেগুলো লুফে নিয়ে ছড়িয়ে রেখেছে এই রান্নাঘরের মেঝেতে?

কপাল কুঁচকে রইলেন কর্নেল ডিসুজা। তিনি বিলক্ষণ হতভম্ব হয়েছেন।

হাতের বুলেট মেঝেতে ফেলে দিয়ে নতুন কয়েকটা সিসে তুললেন কর্নেল। আরও হতভম্ব হলেন। এ যে তাঁর নিজের রিভলভারের বুলেটের মতন।

ফেলে দিলেন মেঝেতে। তুললেন অন্য সিসের গুলি। রকমারি পয়েন্টের কার্তুজ।

হাজত দারোগা সুমন্ত সেনও মরবার আগে গুলিবর্ষণ করেছিল। তার সিসেগুলোও উড়ে এসে এখানে পড়ে নেই তো?

কাদের সঙ্গে লড়তে নেমেছেন কর্নেল ডিসুজা?

বাড়িটা অসাধারণ পরিষ্কার-পরিছন্ন। কিন্তু অস্বস্তি জাগিয়ে তোলে সুরেশ সাইকিয়ার মনে। সবুজ আর হলুদ রঙের বড্ড বাড়াবাড়ি। কার্পেট সবুজ তো দেওয়াল হলুদ। সোফায় হলদে সবুজ পাতা আর ফুল, চেয়ারগুলোয় মরকত সবুজ ঢাকনি, চীনেমাটির ল্যাম্পশেড হলুদ তো ঝুমকোগুলো সবুজ। দুটো বড় ছবি ঝুলছে দেওয়ালে, দুটোতেই সবুজ মাঠ আর হলুদ ফুলের ছড়াছড়ি। সবচেয়ে বাজে শোবার ঘর। চোখ ঝলসানো উৎকট ওয়াল পেপার দিয়ে মোড়া চারটে দেওয়াল।

ডেডবডি পড়ে নেই কোথাও। সেইটাই রক্ষে। রঙের ধাক্কাতেই চোখ আর মন কাহিল, ডেডবডি দেখলে অবস্থা হত আরও শোচনীয়।

রান্নাঘরের সিঙ্কটা পর্যন্ত সবুজ আর হলুদ রঙের। এরকম উৎকট বর্ণবাতিক সচরাচর দেখা যায় না। তাই কর্নেল ডিসুজা এগিয়ে গেছিলেন সিঙ্কের সামনে। থমকে গেছিলেন। হাত নেড়ে ডেকেছিলেন সুরেশ সাইকিয়া আর মাধবীকে।

সিঙ্ক ভরতি শুধু জড়োয়া গয়না আর হাতঘড়ি। বিয়ের আংটি গাদা গাদা। দামি দামি হাতঘড়ি অজস্র। মূল্যবান পাথরের নেকলেস থেকে আরম্ভ করে যত রকমের অলঙ্কার হতে পারে, সব দিয়ে বোঝাই করা হয়েছে সিঙ্ক।

ঘষঘষে গলায় বললেন ডিসুজা, ‘গাড়ির মধ্যে যাদের ডেডবডি দেখলাম, আর বাইরে যত ডেডবডি দেখেছি, কারও হাতে হাতঘড়ি দেখিনি, গয়নাগাঁটিও দেখিনি।’

মাধবী বললে, ‘এরকম খুনীও পৃথিবীতে দেখা যায়নি যে খুন করে, গয়নাগাঁটি গা

থেকে খুলে নেয় কিন্তু থলি ভরে সঙ্গে নিয়ে যায় না, অবহেলায় ফেলে যায় রান্নাঘরের সিঙ্কে।'

সুরেশ সাইকিয়া বললেন, 'যারা মিসিং, তাদের গয়না আর রিস্টওয়াচ এখানে নিশ্চয় আছে। বডিগুলো গেল কোন চুলোয়? কোন নরকে?'

জবাব নেই। ঝিকমিক করে যেন বিদ্রুপ করে গেল সিঙ্কভরতি দামি গয়নাগাঁটি আর হাতঘড়িগুলো।

কমপিউটার টারমিনাল অন করে দিয়ে গাংচিলের চিৎকার এবার নিজেই শুনলেন কর্নেল ডিসুজা।

সেইসঙ্গে কুকুরের অবিরাম গজরানি। ঘেমে গেলেন কর্নেল।

আচমকা মিউ মিউ করে উঠল একটা বেড়াল। পরক্ষণেই ঘোড়ার হ্রেষারব।

মোবাইল-ল্যাবের এ-কোণ ও-কোণ দেখে নিলেন কর্নেল। কোনও চিহ্ন দেখতে পেলেন না।

র‍্যাটল স্নেকের খটখট কড়মড় বাদ্যি আরম্ভ হয়ে গেল এরপরেই।

ভনভন করছে মৌমাছি।

আচমকা স্তব্ধ হল মৌমাছি গুঞ্জন। কচি গলায় শুরু হল 'আবোল তাবোল' ছড়া...

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়,
সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে
গাত্রে হল ব্যথা।

কর্নেল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। গলাটা মানুষের, না না-মানুষের তা বোঝা যাচ্ছে না, মানুষের গলায় থাকে প্রাণের ছোঁয়া, এ গলায় তা নেই।

আচমকা খিলখিল করে হেসে উঠে এবার যে ছড়া বলে গেল, তা সুকুমার রায়ের 'ছায়াবাজি' ছড়া থেকে বিশেষ বিশেষ শব্দ তুলে নিয়ে স্বরচিত:

ছায়াবাজি নয় রে বোকা,
এ যে আসল মায়া,
রোদের ছায়া চাঁদের ছায়া,
শিশিরভেজা সদ্য ছায়া—
মায়া... মায়া... সবই মায়া।
গ্রীষ্মকালে শুকনো ছায়া, কাগের
ছায়া, বগের ছায়া
হালকা মেঘের পানসে ছায়া,

গাছের ছায়া, পাতলা ছায়া—
মায়া... মায়া... স্রেফ মায়া।
খামোকা লড়ে মরবি মর—
আমার খিদে মেটার পর।
ছায়া-মায়া কায়া কিছুই আমার নেই কো নেই,
আমি নির্মম, আমি ভীষণ, আমি শূন্য—কিন্তু আমিই সেই।

ছড়া থেমে গেল। আর কোনও আওয়াজ নেই। ঘামছে এখন প্রত্যেকেই।

টিকেন্দ্রনগর থেকে খবরটা এল ঠিক সেই সময়ে—নাটকীয়ভাবে। 'আদিম শত্রু' নামে একটা বই লিখেছিলেন ডক্টর উতঙ্ক চৌধুরী। লোকে তাঁকে বলত আধপাগল। কারণ তিনি ওই বইতে অনেক তথ্য তুলে ধরে বলতে চেয়েছিলেন, এই পৃথিবীর মাটি থেকে, এমনকী সমুদ্রের জল থেকেও মাঝে মাঝে মানুষ আর প্রাণী যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে দলে দলে। এই অদৃশ্যকরণের মূলে রয়েছে এক আদিম আতঙ্ক।

বইটা আর পাওয়া যায় না। বাথরুমের আয়নায় এই বই লেখকের নাম লিখেই আদিম আতঙ্কর পাল্লায় পড়েছেন একজন—নাম তাঁর বিনয় চৌধুরী।

লেখক স্বয়ং আসছেন শিবালয় শহরে।



চাঞ্চল্যকর খবরের পর খবর এসে পৌঁছোচ্ছে মোবাইল ল্যাবরেটরি থেকে। শিবালয় শহরের আকাশে-বাতাসে-জলে-মাটিতে কোথাও কোনওরকম জৈব সংক্রমণ ঘটেনি।

সবচেয়ে তাজ্জব ব্যাপার, ডেডবডি পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তাতে কোনও জীবাণু নেই! শরীর প্রাণশূণ্য হলেই তাতে জীবাণু বাসা বাঁধে, তাই শরীর পচতে থাকে। কিন্তু শিবালয় শহরের ডেডবডিতে কোনও ব্যাকটিরিয়া নেই। এমনকী সজীব শরীরের কোলন অঞ্চলেও যে ব্যাকটিরিয়া থাকে তাও নেই।

শরীর একেবারে জীবাণুশূন্য!

মাধবী আড়ষ্ট গলায় বললে, ‘তার মানে একটাই। বডিগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী প্রিজারভেটিভ, মানে, সংরক্ষণকর রসায়ন দিয়ে টাটকা রাখা হয়েছে।’

কর্নেল ডিসুজা দিশেহারা। ডেকন স্যুট খুলতে খুলতে বললেন, ‘কোথাও যখন জীবাণু সংক্রমণ ঘটেনি, তখন এই পোশাকের বোঝা নামিয়ে রাখা যাক।’

মরিয়া হয়ে গেছেন ভদ্রলোক।

পরি কফি এনে দিচ্ছে। মোট চার কাপ। ডক্টর অপরাজিতা সোম, মাধবী, সুরেশ সাইকিয়া আর নিজের জন্যে। ওরা এখন বসে আছে হোটেলের ডাইনিং রুমে। জানলার কাছে। পড়ন্ত রোদ ধুয়ে দিচ্ছে নিচের রাস্তা। রাত নামবে আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। শুরু হবে আবার এক আতঙ্কঘন দীর্ঘ রাত্রি।

শিহরিত হল মাধবী। চুমুক দিল কফিতে।

অপরাজিতা সোম এখন কর্ডুরয় জিনস আর হলুদ ব্লাউজ পরে আছেন। রেশমের মতন চুল লুটোচ্ছে কাঁধে। বলছেন, 'এরকম কাণ্ড ওয়াল্ট ডিসনির ফিল্মে দেখেছি। কিছু মাকড়শা আর পোকা শিকার ধরে তাদের গায়ে প্রিজারভেটিভ পুরে দেয় পরে খাওয়ার জন্যে। এখানকার বডিগুলো কেটেকুটে দেখা যাচ্ছে সেই একই ব্যাপার। তবে, এই প্রিজারভেটিভ আরও কড়া, আরও উন্নত।'

মাধবীর মনের চোখে ভেসে উঠল বিশালকায় মথ পোকা। কয়েকশো মথ পোকা ঘরে ঘরে ঢুকে প্রিজারভেটিভ ফুঁড়ে দিয়ে যেতে পারে, কিন্তু বন্ধ গাড়ির মধ্যে তারা ঢুকল কী করে?

সুরেশ সাইকিয়া বললেন, 'পোকার কামড়ে শহরসুদ্ধ লোক মারা গেছে, এই কি বলতে চান?'

'সেরকম প্রমাণ এখনও পাইনি। পোকা যখন হুল ফোটায়, হুল ফোটানোর দাগ তো থাকবে শরীরের কোথাও না কোথাও। আমরা সেরকম কোনও পাংচার দেখতে পাইনি ডেডবডিতে।'

'আর একটা ডেডবডি নিয়ে ফের দেখলে হয় না?'

'নিশ্চয় দেখব। তবে আশ্চর্য এই যে, ডেডবডিতে এক্কেবারে পচন ধরেনি ব্যাকটিরিয়া একদম না থাকায়। টিস্যু-বোঝাই প্রিজারভেটিভ রয়েছে। অদ্ভুত!'

'প্রিজারভেটিভ যদি ফুঁড়ে ঢোকানো না হয়, তাহলে শরীরে ঢুকল কী করে?'

'অনুমান করতে পারি।'

'কী অনুমান?'

'চামড়া শুষে নিয়েছে। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে টিসুতে পৌঁছে গেছে।'

'নার্ভ গ্যাস নয় তো?' মাধবীর প্রশ্ন, 'প্রিজারভেটিভ এফেক্টটা স্রেফ সাইড এফেক্ট।'

'না,' অপরাজিতা জবাব দিলেন, 'নার্ভ গ্যাস তো একধরনের বিষ-গ্যাস। জামাকাপড়ে লেশ লেগে থাকতই। তা পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে কী বলতে চান, মৃত্যুর কারণও এই প্রিজারভেটিভ?' জানতে চাইলেন সুরেশ সাইকিয়া।

'মৃত্যুর অন্যতম কারণ বলতে পারেন,' বললেন অপরাজিতা সোম, 'অন্যান্য কারণের মধ্যে অক্সিজেনের অভাবও থাকতে পারে।'

'দম বন্ধ করে মৃত্যু?' ঝুঁকে বসলেন সুরেশ সাইকিয়া।

'হ্যাঁ। কিন্তু কোনটা সঠিক কারণ, তা বলা যাচ্ছে না।'

'যারা মরেছে, তারা দু'এক সেকেন্ডের মধ্যেই মরেছে। দমবন্ধ মৃত্যুতে সময় লাগে তার চেয়ে বেশি। যার দম আটকে আসছে, সে ছটফট করবেই, কিন্তু বহু ক্ষেত্রেই

ছটফটানির চিহ্ন পাওয়া যায়নি।'

'তা ঠিক,' সায় দিলেন বংশাণুবিদ।

'শরীর ফুলে ঢোল হয়েছে কেন?' সুরেশ সাইকিয়া নাছোড়বান্দা।

'প্রিজারভেটিভের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার দরুন হতে পারে।'

'সারা শরীর থেঁতলে যাওয়া?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না অপরাজিতা সোম। দিলেন কিছুক্ষণ পরে ভুরু কুঁচকে, 'বাইরে থেকে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল শরীরের ওপর, পরীক্ষায় তা জানা গেছে। হয়তো প্রিজারভেটিভের আর একটা অ্যালারজিক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া। ফুলে উঠলে শরীরের সর্বত্র অমন কালসিটে পড়ে না। ঠিক যেন কিছু দিয়ে মারা হয়েছে। ঘনঘন মেরেই যাওয়া হয়েছে। অবিশ্বাসটা জাগছে সেইখানেই। এইভাবে পিটিয়ে গেলে অন্তত একটা হাড় ভো ভাঙবেই। অদ্ভুত ব্যাপার রয়েছে আর এক ক্ষেত্রে। গোটা শরীরের সমস্ত জায়গায় কালসিটের মাত্রা একই রকম, কম-বেশি কোথাও নেই। উরুতে যতখানি কালসিটে, বগলেও ঠিক ততখানি। অসম্ভব। বগলে মুগুর পৌঁছোয় না। জুতো পরে থাকা ডেডবডির পায়ের পাতায় কালসিটে পড়ল কী করে?'

মাধবী বললে, 'কালসিটের কারণ তাহলে নির্ণয় করা যায়নি? মৃত্যুর কারণও জানা যায়নি?'

'না,' চেয়ারে ঠেসান দিয়ে বসলেন অপরাজিতা সোম। তাঁর মুখে এখন দুশ্চিন্তার ছাপ। অপরাহ্ন আরও গড়িয়েছে। রাস্তা একদম ফাঁকা। গাছগুলো নিস্পন্দ। গোটা শহরে কবরের নীরবতা। 'কর্নেল ডিসুজারা এত দেরি করছেন কেন? দশ মিনিট আগেই ফিরে আসা উচিত ছিল।'

উঠে দাঁড়ালেন সুরেশ সাইকিয়া, 'আমি গিয়ে দেখছি।'

উঠে দাঁড়ালেন অপরাজিতা সোমও, 'লক্ষণ সুবিধের ঠেকছে না।'

মাধবীও তা টের পাচ্ছে।

আতঙ্ক ফের খেল দেখাতে শুরু করেছে শিবালয় শহরে।



থমথমে নিস্তব্ধ রাস্তায় পাওয়া গেছিল চারটে ডেকন স্যুট। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ফুটপাতে, ড্রেনের ওপর, রাস্তার মাঝখানে। সাবমেশিনগানগুলোর অবস্থাও তাই। ট্রাকের পেছনের দরজা খোলা। গাড়ির মধ্যেও প্রচুর ডেকন স্যুট, মানুষ নেই ভেতরে। পড়ে রয়েছে তাদের সাবমেশিনগান।

হাঁক দিলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'কর্নেল ডিসুজা?'

কবরের নৈঃশব্দ্য।

বলল মাধবী, 'গুলিবর্ষণের সুযোগ কেউ পায়নি দেখছি।'

'চেঁচাতেও পারেনি,' বললেন অপরাজিতা সোম, 'হোটেলে আওয়াজ নিশ্চয়ই পৌঁছোত।'

দুটো মোবাইল ল্যাবরেটরির দরজা খোলা। ভেতর থেকে বন্ধ নয়। ভেজানো।

সুরেশ সাইকিয়ার কেমন জানি মনে হল, ভেতরে ওঁত পেতে রয়েছে অজানিত আতঙ্ক।

রিভলভার হাতে নিয়ে একটা মোবাইল ল্যাবরেটরির দিকে এগোলেন সুরেশ সাইকিয়া। ঝটকান মেরে খুললেন দরজা। কেউ নেই ভেতরে। দুটো ডেকন স্যুট দুমড়ে মুচড়ে পড়ে রয়েছে মেঝেতে। আর একটা ঝুলছে কমপিউটার টার্মিনালের সামনের চেয়ারে।

এগিয়ে গেলেন দ্বিতীয় মোবাইল ল্যাবের পেছনের দরজায়। এবার দরজা খুললেন আস্তে আস্তে...

এখানেও নেই কেউ। দুটো ডেকন স্যুট পড়ে রয়েছে মেঝেতে।

আচমকা নিভে গেল ভ্যানের সমস্ত সিলিং লাইট। চমকে উঠলেন সুরেশ সাইকিয়া। পরক্ষণেই নিবিড় তিমির পাতলা হয়ে গেল হালকা সবুজ আভায়। এই আভা আসছে তিনটে ভিডিয়ো ডিসপ্লে টার্মিনাল থেকে। আচম্বিতে চালু হয়ে গেছে তিনটেই—নিজে থেকে।

শুধু চালু হয়েই যায়নি, জ্বলে উঠেই নিভে যাচ্ছে, আবার জ্বলে উঠছে। এতক্ষণ একই সঙ্গে তিনটেই জ্বলছিল আর নিবছিল, এবার একটার পর একটা জ্বলে উঠেই নিভে যেতে লাগল। এইভাবে চলল পর্যায়ক্রমে, তারপর জ্বলে রইল তিনটেই একসঙ্গে। অপার্থিব সবুজ আভায় থমথমে হয়ে রইল মোবাইল ভ্যানের ভেতরটা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে ভেতরে ঢুকে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া, কারও নিষেধে কান দিলেন না। প্রথম টার্মিনালটার সামনে পৌঁছোতে না পৌঁছোতেই ইংরেজিতে যে শব্দগুলো ভেসে উঠল কালো পটভূমিকায় ফিকে সবুজ আলোয়, সেগুলোর বাংলা তর্জমা এই: *আমি জানি, ঈশ্বর আমাকে ভালোবাসেন।*

তিনটে স্ক্রিনেই ফুটে উঠেছে একই লেখা। মিলিয়ে গেল শব্দগুলো। ফুটল নতুন শব্দ।

ধর্মগ্রন্থের কপচানি লিখে গেলাম।

ভুরু কুঁচকে গেল সুরেশ সাইকিয়ার। এ আবার কী প্রোগ্রাম? কর্নেল ডিসুজার বৈজ্ঞানিক সহচররা নিশ্চয় এই আজব কথা কমপিউটারকে শিখিয়ে রাখেননি।

দপ করে একই সঙ্গে নিভে গেল তিনটে পর্দাই। জ্বলে উঠল পরক্ষণেই। এবার নতুন কথা: *ভগবান-টগবান কিসসু নেই।*

নিভে গিয়েই ফের ফুটিয়ে তুলল নতুন কথা।

আমি আছি। জ্যান্ত আমি।

কুড়িটা প্রশ্ন করব। জবাব দিতে পারবে?

রক্ত ঠান্ডা হয়ে এল সুরেশ সাইকিয়ার।

মোটর অ্যাকসিডেন্টের পর তোমার স্ত্রী-র ডেডবডি পাওনি কেন? কারণ সেই লাশ গড়িয়ে গেছিল খাদে। কঙ্কালটা আছে, বাকি সব আমার খিদে মিটিয়েছে। তোমার ছেলের জ্ঞান ফিরবে না। তাকেও আমি শেষ করব।

থ হয়ে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া। সন্ধ্যা যত এগিয়ে আসছে, ঠান্ডা তত বাড়ছে। তা সত্ত্বেও ঘেমে উঠলেন পুলিশ প্রধান। এত ঘরোয়া খবর কমপিউটার জানিয়ে যাচ্ছে কী করে?

মনের কথা টের পেয়েই যেন জবাব দিয়ে গেল কমপিউটার।

কারণ, আমি সব জানি। আরও বলব?

'ডক্টর সোম,' ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'ভেতরে আসুন।'

তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে মোবাইল ভ্যানের ভেতর ঢুকলেন অপরাজিতা সোম।

'কমপিউটারে কীসব আবোলতাবোল প্রোগ্রাম ঢুকিয়ে রেখেছেন?'

ভুরু কুঁচকে গেল অপরাজিতা সোম-এর। ওঁর চোখের সামনেই নতুন লেখা ফুটে উঠল স্ক্রিনে:

বংশানুবিদ নাকি? হালে পানি পাবে না।

'কে তুমি?'

আমিই সেই... যে ছিল... যে আছে... যে থাকবে।

সুরেশ সাইকিয়া বললেন, 'এ যে কথা বললেও জবাব দিচ্ছে। জ্যান্ত কমপিউটার।'

'তোদের যম আমি।'

অপরাজিতা সোম অটোমেটিক টাইপ রাইটারের সুইচ অন করে দিলেন। মুখে বললেন সুরেশ সাইকিয়াকে, 'প্রশ্ন আর উত্তর দুটোরই রেকর্ড থাকুক। পরে কাজে লাগবে।'

ঘেঁচু কাজে লাগবে। তোরা মরবি।

খটাখট টাইপ করে গেলেন অপরাজিতা সোম।

'কেউ এখানে আছে নাকি?'

হ্যাঁ।

'কে তুমি?'

যাকে গুনে শেষ করা যায় না।

'কী নাম তোমার?'

অনেক।

'একটা নাম বলো।'

বললে আঁৎকে উঠবি।

'তবুও শুনি।'

ধ্বংস।

'আর কী কী নাম আছে?'

বাজে বকিসনি।

'তোমার চেহারার বর্ণনা দাও।'

আমি জ্যান্ত।

'আরও খুলে বলো।'

আমি খোলাখুলি—টের পাবি ঠিক সময়ে।

'তুমি কি মানুষ?'

মানুষ হলেও হতে পারি।

'কর্নেল ডিসুজা কোথায়?'

খতম।

'ডেডবডি কোথায়?

নেই।

'কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে?'

বড় বাজে বকছিস।

'কর্নেল ডিসুজার সঙ্গে যারা ছিল, তারা কোথায়?'

খতম।

'কে খতম করেছে? তুমি?'

হ্যাঁ।

'কেন করলে?'

বাজে বকিসনি।

'কেন খতম করলে?'

বড্ড বাড় বেড়েছে তোর।

'খতম করলে কেন?'

সব মরেই আছিস—যত্তসব মাথামোটা।

'কেন মারতে চাও আমাদের?

মরবার জন্যেই তো তোরা আছিস।

'টিকে আছি শুধু মরবার জন্যে?'

তোরা আমার কাছে পোকামাকড়।

'কী নাম তোমার?'

শূন্য।

'বুঝিয়ে দাও।'

কিংবদন্তী।

'বুঝিয়ে দাও।'

তোর হেঁড়ে মাথায় গোবর আছে।

মাধবী বললে, 'স্রেফ পাগলামি, নয়তো মজা করা হচ্ছে।'

পরি বলে উঠল, 'মজা নয়, মজা নয়, বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠছে, আরও বেশি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে... সে আসছে... কায়াগ্রহণ করতে চলেছে।'

মাধবী চেয়ে রইল বোনের দিকে। এই উপলব্ধিটা তার লোমকূপেও এতক্ষণ শিহরণ জাগিয়ে চলেছিল। স্পষ্ট করে বলে উঠতে পারেনি।

সুরেশ সাইকিয়ার অবশ্য তা মনে হয়নি। প্যানিক আর টেনশন শরীরের ভেতর পর্যন্ত পালটে দেয়। এখন তাঁর ক্ষেত্রে ঠিক তাই হচ্ছে। গা ছমছম করছে। মনে হচ্ছে, এখুনি বুঝি অদৃশ্যলোক থেকে দৃশ্যমান হবে কল্পনাবহির্ভূত এক বিভীষিকা।

কমপিউটার স্ক্রিনগুলোয় একই সঙ্গে এবার ফুটে উঠল একটা প্রশ্ন।

সে আসছে কখন?

'কে আসছে?'

ভূতের ওঝা।

'সে কে?'

উতঙ্ক চৌধুরী।

'উতঙ্ক চৌধুরীকে ভয় পাও?'

তোকে আগে মারব।

'উতঙ্ক চৌধুরীকে ভয় পাও?'

তোকে সরু সুতোর মতন ফালা ফালা করব।

'উতঙ্ক চৌধুরীকে ভয় পাও?' আঙুল কাঁপছে অপরাজিতার।

আমি কাউকে ভয় পাই না।

'তাহলে উতঙ্ক চৌধুরীর খবর জানতে চাইছ কেন?'

ও জানে আমি জানতে পেরেছি।

'কী জানে?'

আমার সম্বন্ধে।

'তুমি কী বা কে তা জানে?'

হ্যাঁ, তাকে চাই—এখানে।

'কেন?'

আমার জীবনী লেখাব তাকে দিয়ে। তাই সে আসুক।

'তাকেও মারবে নাকি?'

না, তাকে নিরাপদে বের করে দেব।

'বুঝিয়ে দাও।'

তোরা সব্বাই মরবি। শুধু বাঁচিয়ে রাখব উতঙ্ক চৌধুরীকে। সেইটাই ওকে বলবি। নিরাপদে বেরিয়ে যেতে দেব—এ খবর না জানলে ও আসবে না।

'উতঙ্ক চৌধুরীকে নিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে?'

বিনয় চৌধুরী একটু জেনে ফেলেছিল তাই তাকে সরিয়েছি। তোরা জেনেছিস, তোরাও মরবি... মরবি...।

'বাঁচতে দেবে না?

না।

'তুমি এসেছ কোত্থেকে?'

যেখানে সময় গেছে দাঁড়িয়ে।

'বুঝলাম না।'

সময় শুরু হয়েছে যেখান থেকে—সেখান থেকে।

'এখনও বুঝলাম না।'

মরলে বুঝবি।

'তুমি কি অন্য গ্রহ থেকে এসেছ?'

না।

'তুমি কে?'

বকাসনি।

'তুমি কী?'

বকাসনি।

'তুমি কী?' আঙুল থরথর করে কাঁপলেও টাইপ করে গেলেন অপরাজিতা।

আমি মহা আতঙ্ক। আমি নামহীন দেহহীন বিভীষিকা। আমি যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ কিম্ভুত অদ্ভুত হয়ে যেতে পারি, আমি মানুষ হতে পারি, দেবতাও হতে পারি। কখনও আমি কবন্ধ, কখনও আমার দশ মুণ্ড। দশটা মুণ্ডর একটা সাপের, একটা বাঘের, একটা হায়নার, একটা গণ্ডারের... আর শুনে কাজ নেই... আমিই সব... আমিই সব। অথচ আমি কেউ না। আমি স্রেফ শূন্য। অথচ আমি আছি সর্বত্র।

দপ দপ করে বারকয়েক জ্বলে অবশেষে নিভে গেল তিনটে টার্মিনাল। জ্বলে উঠল সিলিং এর আলো।

বুকের খাঁচা থেকে লম্বা নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'শেষ হল ইন্টারভিউ।'



দ্রুত ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কোণে কোণে জমছে আঁধার। আকাশে কার্নিভালের রং লেগেছে—কমলা, লাল, হলুদ, বেগুনি। অথচ শিবালয় শহরে নামছে সামান্য আলো।

মোবাইল ল্যাবরেটরি পেছনে রেখে এগিয়ে গেল সবাই হোটলের দিকে। মোড়ের মাথায় জ্বলে উঠল স্ট্রিটল্যাম্প।

গোঙানির আওয়াজটা শোনা গেল ঠিক এই সময়ে।

ওদিকের ফুটপাথে লেংচে লেংচে যাচ্ছে একটা মস্ত অ্যালসেশিয়ান কুকুর। বড় কষ্টে পেছনের জখম একটা পা ঘষটে ঘষটে নিয়ে যাচ্ছে ফুটপাতের ওপর দিয়ে।

স্তম্ভিত চোখে চেয়ে রইলেন সুরেশ সাইকিয়া। মাধবীও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। কেননা, শিবালয় শহরে এই প্রথম দেখা গেল জীবন্ত প্রাণী।

টম ডিক্সন একদৃষ্টে চেয়েছিল কুকুরটার দিকে। সুরেশ সাইকিয়ার এই সঙ্গীটি আকার-আয়তনে দৈত্য সমান হলে কী হবে, স্বভাবে শিশুর মতন। গুলি চালায় নির্ভুল নিশানায় অথচ নিতান্ত নিরুপায় না হলে ট্রিগারে আঙুল চেপে বসে না। মায়া-দয়ার শরীর, মানুষ মারা তো দূরের কথা, মানুষ আর মনুষ্যেতর প্রাণীর তিলমাত্র কষ্ট দেখলেই তার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। অথচ সে পুলিশ সার্জেন্ট।

কুকুরের কাতরানি বিলক্ষণ বিচলিত করেছে তাকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে যাচ্ছে রাস্তা পেরিয়ে যন্ত্রণাকাতর প্রাণীটির দিকে।

ধমকে উঠলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'যেও না।'

টম ডিক্সন যেন মন্ত্রমুগ্ধ। শুনতেই পেল না।

বামাকণ্ঠের চিৎকারটা শোনা গেল তারপরেই। চেঁচাচ্ছে মাধবী। সন্দেহটা তার মনের মধ্যেও ফণা তুলেছে, 'ডোন্ট গো।'

রাস্তা পেরিয়ে ওদিকের ফুটপাতে পৌঁছে গেল টম ডিক্সন। হেঁট হয়ে সস্নেহে আহত সারমেয়কে তুলে নিল বুকে।

অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটল পরক্ষণেই। জিব বের করে টম ডিক্সনের হাত চাটতে লাগল অ্যালসেসিয়ান।

গা শিরশির করে উঠেছিল টম ডিক্সনের। জীবন্ত প্রাণী যে এত কনকনে ঠান্ডা হয়, তা তো তার জানা ছিল না। বিশেষ করে কুকুর। গা তো গরম নয়, উলটে কেমন যেন ভিজে ভিজে।

জিব যেন আরও ঠান্ডা, ঠিক যেন বরফ দিয়ে তৈরি।

পরিবর্তনটা দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে।

গলে যেতে লাগল অ্যালসেসিয়ান। লোম অন্তর্হিত হল, চামড়া থসথসে হয়ে গেল। একদলা অবয়বহীন জেলির পিণ্ড বুকের কাছে ধরে রইল টম ডিক্সন।

নিদারুণ আতঙ্কে টম ডিক্সনের চক্ষুও বিস্ফারিত হয়েছে। সেই সঙ্গে অবর্ণণীয় যন্ত্রণাবোধ গোটা শরীরকে দুমড়ে-মুচড়ে দিতে চাইছে। ওর দুটো হাতই ঢুকে গেছে জেলির পিণ্ডর মধ্যে। বিষম যন্ত্রণার উৎস ওই দুটো হাত। যেন মাংস গলে যাচ্ছে কড়া অ্যাসিডে...

ঝটকান মেরে দুটো হাতই টেনে বের করে আনল টম ডিক্সন।

শুধু হাড় রয়েছে। আঙুলের ডগা থেকে কনুই পর্যন্ত শুধু সাদা হাড়। মাংস, চামড়া, টিসু সব অদৃশ্য হয়ে গেছে জেলিপিণ্ডর মধ্যে।

পরিত্রাহি আর্তনাদ বিরামবিহীনভাবে বেরিয়ে আসছে টম ডিক্সনের গলা চিরে। কেননা, জেলিপিণ্ডকে সে ধরে নেই দু'হাতে—জেলিপিণ্ড কিন্তু আঁকড়ে আছে তার বক্ষদেশ। সেখানেও শুরু হয়েছে অকথ্য যন্ত্রণা। চামড়া মাংস বিলীন হয়ে যাচ্ছে জেলিপিণ্ডর গর্ভে। কদাকার পিণ্ড ফুলে উঠছে, গুটি গুটি এগোচ্ছে টম ডিক্সনের গলা আর কাঁধের দিকে। গগনভেদী চিৎকার করে যাচ্ছে বেচারী। মরিয়া হয়ে কঙ্কাল হাত দিয়ে জেলিপিণ্ড আঁকড়ে ধরে ছিনিয়ে নিতে গেল বুকের ওপর থেকে।

কনুই পর্যন্ত হাত অদৃশ্য হয়ে গেল জীবন্ত জেলিপিণ্ডর মধ্যে। চকিতে হাড় পর্যন্ত হজম করে নিল অপার্থিব ভয়ংকর সেই জেলি।

এ দৃশ্য আর দেখতে পারলেন না সুরেশ সাইকিয়া। এরপর কী ঘটবে, কী নারকীয় দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হবে তা তিনি আঁচ করে নিয়েছেন। তাই, রিভলভার

টেনে নিয়ে ধেয়ে গেলেন রাস্তার ওপর দিয়ে। জেলিপিণ্ড আর টম ডিক্সনের খুব কাছে গেলেন না। যদি অবয়বহীন পিণ্ড ছিটকে আসে তাকে লক্ষ করে?

রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে নিপুণ নিশানায় গুলি চালিয়ে দিলেন প্রিয় সার্জেন্টের খুলির মধ্যে। এবং, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে গোটা শরীরটার ওপর ছড়িয়ে গেল কালচে-হলুদ রঙের সর্বভুক জেলিপিণ্ড। ফুলে ফুলে উঠে টোল খেয়ে যেতে লাগল চারিদিকে। টম ডিক্সনকে আর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তার কী হাল হচ্ছে, সেটা আঁচ করা যাচ্ছে।

দেখাও গেল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তার বেশি নয়।

টম ডিক্সন বিলীন হয়ে গেছে জেলিপিণ্ডর অভ্যন্তরে। জেলিপিণ্ডও আয়তনে বৃহত্তর হয়েছে। টম ডিক্সনের গোটা শরীরটা যে এখন তার নিজস্ব উপাদান হয়ে গেছে।

স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না অপরাজিতা সোম। টম ডিক্সনকে নিজের মধ্যে শুষে নিল যে জেলিপিণ্ড, তার যেন ডিএনএ-র ওপর পুরো নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। চেহারা পালটাতে পারে খুশিমতো, অবিশ্বাস্য গতিবেগে—
হাড়গোড় পর্যন্ত পালটে নেয় নিজের উপাদানে।

এ ধরনের কোনও প্রাণী তো নেই। অসম্ভব। অপরাজিতা সোম জীববিজ্ঞানী। অপরাজিতা সোম বংশাণুবিদ। অথচ এহেন কাণ্ড তাঁর জ্ঞানবুদ্ধির সম্পূর্ণ বাইরে।

তাঁর বিস্ফারিত চক্ষুর সামনেই সহসা থলথলে জেলিপিণ্ড মাকড়সার আকার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল ফুটপাতের ওপর। অতিকায় অ্যামিবা আর ফাংগাসের মাঝামাঝি আকৃতি নিয়ে। ফুটপাতের ওপর দিয়ে মন্থরগতিতে পিছলে গেল অনতিদূরের খোলা ম্যানহোলের দিকে—যার ভেতরে ঢুকে রয়েছে ফিল্ড ল্যাবরেটরির ইলেকট্রিক পাওয়ার কেবল।

সুরেশ সাইকিয়া আর নিজেকে ধরে রাখতে পারলেন না। উপর্যুপরি গুলিবর্ষণ করে গেলেন চলমান জেলিপিণ্ড লক্ষ করে। প্রত্যেকটা তপ্ত সিসে পিণ্ডদেহ ফুটো করে ভেতরে প্রবিষ্ট হল, তার বেশি কিছু না। জেলিদেহ কিম্ভূত আকার নিয়ে নির্বিকারভাবে এগিয়ে গেল ম্যানহোলের দিকে।

বিকট স্তম্ভটার আবির্ভাব ঘটল ঠিক তক্ষুণি, ম্যানহোলের ভেতর থেকে।

গোধূলি তখন ছায়াচ্ছন্ন করে তুলেছে রাজপথকে। অস্পষ্ট সেই আলোতে সহসা অবিশ্বাস্য গতিবেগে ম্যানহোলের ভেতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল একটা জেলিপিণ্ড। নিমেষে ঠেলে উঠল ওপর দিকে থামের মতন। ম্যানহোলের গর্ত যতটা ব্যাসের, স্তরে ব্যাসও ঠিক তাই। যেন গোটা ম্যানহোলের তলদেশ ঠাসা রয়েছে এই জেলিপিণ্ড দিয়ে। দেখতে দেখতে ঠেলে উঠল দশ ফুট ওপরে। স্তব্ধ হল ঊর্ধ্ববেগ।

দুলতে লাগল সাপের মতন। পরক্ষণেই সপাং সপাং করে আছড়ে পড়ল রাস্তায় আর ফুটপাতে। বিষম সংঘাতের বিপুল শব্দ কাঁপিয়ে তুলল শহর...

ইতিমধ্যে ফুটপাত কামড়ে ধরে সর্বভুক থলথলে জেলিপিণ্ড আছাড়ি-পিছাড়ি খাওয়া বিপুলকায় জেলিস্তম্ভের কাছে গিয়ে নিজেকে মিশিয়ে দিল থামের মধ্যে—যেন একই সত্তা—এতক্ষণ ছিল আলাদা, ছিল অন্য এক কার্যভার নিয়ে, সে কাজ শেষ করে ফিরে গেল মূল দেহে।

সোঁ-ও-ও শব্দ তুলে বিরাট স্তম্ভ সাঁৎ করে ঢুকে গেল ম্যানহোলের মধ্যে—প্রকৃত নিবাসে।



থমথমে মুখে ওরা ফিরে এসেছিল হোটেলে আর এক দফা শিহরিত হবার জন্যে। হোটেলে সান্ত্রীদের কেউ নেই। জিনিসপত্র অস্ত্রশস্ত্র যেখানে থাকার সেখানেই আছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে দশজন মানুষ!

হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছ'জন। এসেছিল অনেকজন, বেঁচে রয়েছে শুধু এই ছ'জন।

'আহার্য নিবাস'এর পাশের গলিতে গতরাতে সঞ্চরমান তমালপুঞ্জ দেখেছিল মাধবী। মনে হয়েছিল মাথার ওপর মাচায় কী যেন নড়ছে। পরির মনে হয়েছিল, দেওয়ালে গুঁড়ি মেরে কী যেন বসে রয়েছে। এখন মনে হচ্ছে, দু'জনেই ঠিক দেখেছে। মুহুর্মুহু দেহ পালটায় যে, সে নিশ্চয় ওঁত পেতে ছিল সুড়ঙ্গের অন্ধকারে, ড্রেনের ভেতরে। নিঃশব্দে পিছলে যাচ্ছিল মাচার ওপর দিয়ে, দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে। সুরেশ সাইকিয়াও পরে দেখেছিলেন, কী যেন চকচক করছে ড্রেনের মধ্যে। নিশ্চয় দেখেছিলেন তাল তাল প্রোটোপ্লাজম—ওঁত পেতে ছিল ড্রেনের ফোকরে, নজর রাখছিল ঘরের সবার ওপরে।

প্রথম মুখ খুলল মাধবী। বললে, 'বন্ধ ঘরের রহস্য আর রহস্য নেই। দরজার তলার ফাঁক দিয়ে অথবা পাইপের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিতে পারে কুৎসিত এই বহুরূপী জেলি।'

বললেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘কাচতোলা বন্ধ-দরজা গাড়িগুলোর ভেতরের রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। গোটা গাড়িগুলোই হয়তো চারিদিক থেকে আঁকড়ে ধরেছিল, ফুটোফাটা দিয়ে ঢুকে পড়েছে ভেতরে।’

বাইরে কুয়াশা জমছে রাস্তার ওপর। স্ট্রিটল্যাম্পের আলোক-বলয় ঘিরে গড়ে উঠছে অস্বচ্ছ কুয়াশাপুঞ্জ।

সুরেশ সাইকিয়া বললেন, ‘পাঁচটা টহলদার গাড়ি যখন রয়েছে, পাঁচ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাব শহর থেকে।’

‘মাঝপথেই আটকে দেবে,’ মাধবীর মন্তব্য।

‘সব শুনছে কিন্তু আড়াল থেকে,’ পরির চোখ ঘুরছে চারদিকে, ভয় ভাসছ চোখে। বারান্দা থেকে সরে এসে এখন বসে আছে ওরা ডাইনিংরুমে টেবিল ঘিরে। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে প্রত্যেকে প্রত্যেকের মনের কথা বোঝার চেষ্টা করছে।

শুরু করলেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘আশ্চর্য ক্ষমতা বটে। ইচ্ছে করলে পেল্লায় মথও হতে পারে।’

‘কুকুর হতেও আপত্তি নেই,’ পরির মন্তব্য।

‘যা খুশি, তাই হতে পারে। আমার তো মনে হয়, যাকে গ্রাস করছে, তার চেহারা নিচ্ছে,’ মাধবী বুঝিয়ে দিলে।

‘অতবড় মথ কি পৃথিবীতে আছে?’ বললেন সুরেশ সাইকিয়া।

‘হয়তো ডাইনোসর আমলে ছিল।’

অবুঝের মতন বলে ওঠে পরি, ‘কী যে বলো। ম্যানহোল থেকে যার আবির্ভাব সে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে রয়েছে ম্যানহোলের নিচে পাতালে?’

‘জীববিজ্ঞানের হিসেবে সেটা সম্ভব নয়,’ বললেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘ডক্টর সোম, আপনি কী বলেন?’

‘না, বায়োলজি তা মানতে পারে না,’ অপরাজিতা সোম বিলক্ষণ ধোঁকায় পড়েছেন।

‘তাহলে কি সর্বভুক সর্বজ্ঞ সর্বরূপী এই জেলি অমর?’

চোখ নামিয়ে ভেবে নিলেন অপরাজিতা সোম। তারপর বললেন চোখ তুলে, ‘হতে পারে মেসোজোয়িক পিরিয়ডেও ছিল, ক্রমাগত নিজেকে পালটে নিয়ে প্রকৃতপক্ষে অমর হয়ে রয়েছে।’

বলে উঠলেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘ভ্যামপায়ার নাকি?’

‘মানে?’ চমকে উঠলেন অপরাজিতা সোম।

‘প্রাণশক্তি শুষে নিয়ে অমর হয়ে থাকে ভ্যামপায়ার, বই পড়ে জেনেছি। এটাও কি সেই জাতীয় কিছু? যাকে গ্রাস করছে, তার প্রাণশক্তি, তার মেদ-মজ্জা-মাংস, তার

জ্ঞান, তার স্মৃতি—সবই আত্মসাৎ করে অমর হয়ে রয়েছে?

থমকে গেলেন অপরাজিতা, 'মনে তো হচ্ছে তাই। একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলি শুনুন। বিশেষ একটা পোকাকে একটা গোলকধাঁধায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। গোলকধাঁধায় ঘুরে খাবারের জায়গায় পৌঁছোতে তার সময় লেগেছিল অনেক। তাকে মেরে, চটকে খাবারের সঙ্গে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল আর একটা পোকাকে। সেই পোকাকে ছেড়ে দেওয়া হয় একই গোলকধাঁধায়। অনেক সহজে, অনেক কম সময়ে খাবারের কাছে পৌঁছে গেছিল সেই পোকা। ঠিক যেন আগের পোকার অভিজ্ঞতা আর স্মৃতি তার মনের ভাঁড়ারে জমা পড়ে গিয়েছে—'

ঢোক গিলে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'তাহলে তো বলতে হয়, বিনয় চৌধুরীকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে ভদ্রলোকের মগজের জ্ঞান আর স্মৃতিও আত্মসাৎ করেছে এই বিভীষিকা। বিনয় চোধুরী জানতেন উতঙ্ক চৌধুরীর নাম। আরও জানতেন একমাত্র উতঙ্ক চৌধুরীই জানেন, এই পাতাল-বিভীষিকা আসলে কী। ফলে, পাতাল-বিভীষিকাও জেনে গেছে উতঙ্ক চৌধুরীর নাম—খুঁজছে তাঁকে।'

'বুঝলাম,' শক্ত গলায় বললে মাধবী, 'কিন্তু উতঙ্ক চৌধুরী জানলেন কী করে, পাতাল-বিভীষিকা আসলে কী?'

'জবাবটা শুধু উতঙ্ক চৌধুরীই দিতে পারবেন।'

'পরিকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিল কেন? আমরাই বা এখনও টিকে আছি কেন?'

'টোপ, টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে আমাদের।'

'কাজ শেষ হলেই—'

'আমরাও শেষ হব।'

ধুম করে বিচ্ছিরি শব্দ শোনা গেল বাইরে। তেড়ে উঠে দাঁড়ালেন সুরেশ সাইকিয়া। আবার হল সেই শব্দ। আরও জোরে।

কান পেতে রইলেন সুরেশ সাইকিয়া। আওয়াজটা আসছে বাড়ির উত্তরের দেওয়াল থেকে মাটির লেভেলে শুরু হয়ে দ্রুত উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে।

কড়মড়-খটমট-খটখটাং শব্দ। যেন শুকনো নরকঙ্কালরা দল বেঁধে দেওয়াল বেয়ে উঠছে।

'নতুন রূপ ধারণ করেছে পাতাল বিভীষিকা,' বললেন সুরেশ সাইকিয়া।

ছ'জনে এগিয়ে গেল জানলার সামনে। কুয়াশা আরও ঘন হয়েছে।

হঠাৎ দেখা গেল রাস্তার ওপর এক আশ্চর্য আকৃতি। মাকড়সার জালের মতন তন্তুময় পা। কুয়াশায় দৃষ্টিভ্রম ঘটছে—অর্ধেক দেখা যাচ্ছে, বাকি অর্ধেক রহস্যময়। মস্ত গাড়ির মতন কিছু একটা হবে। খাঁজকাটা দাড়া—কাঁকড়ার দাড়ার

মতন, কিন্তু আকারে দানবিক। অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পরমুহূর্তেই। তারপরই দেখা গেল লিকলিকে শুঁড়, অ্যান্টেনার মতন দুলছে শূন্যে অনেকগুলো। পরক্ষণেই সবই হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

শুষ্ক কণ্ঠে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'এদেরই একজন উঠছে ছাদে।'

খটখট-কড়কড় আওয়াজ হচ্ছে এখন ছাদে। যেন হাতুড়ি পেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে।

বলে উঠল পরি, 'বিচ্ছিরি বিকট চেহারা ধারণ করছে কেন, দিদি?'

'ভয় দেখানোর জন্যে।'

থেমে গেল ছাদের আওয়াজ। ঢোক গিলে বললেন অপরাজিতা সোম, 'সারা গায়ে কালসিটের কারণটা এবার বোঝা গেল। পুরো দেহ মুড়ে নিয়ে চাপ দিয়ে গেছে, নিংড়ে নিয়েছে। প্রচণ্ড চাপ সমানভাবে পড়েছে, তাই অমন কালসিটে। দম আটকে গেছে এই কারণেই।'

'প্রিজারভেটিভ প্রয়োগ করেছে একই সঙ্গে,' বললে মাধবী।

'সেইজন্যেই ইঞ্জেকশন দেওয়ার দাগ কোথাও দেখা যায়নি। গোটা শরীরের প্রতি বর্গইঞ্চিতে প্রতিটি লোমকূপের ভেতর দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে প্রিজারভেটিভ। বলতে পারেন, এক ধরনের অসমোটিক প্রেসার—অভিস্রবণ চাপ।'

বাসন্তীর ডেডবডির কথা মনে পড়ে গেল মাধবীর। শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ। অভিস্রবণ শক্তি কতখানি জোরদার হলে নিমেষে এমন কাণ্ড ঘটতে পারে?

'জলটা কীসের?' মাধবীকে চমকে দিয়ে বলে উঠল পরি।

'জল?'

থই থই জল দেখা গেছে অনেক জায়গায়। সর্বরূপী আতঙ্ক নিংড়ে ফেলে রেখেছে ওই জল।'

'এমন ভাবনা মাথায় আসছে কেন?'

বিজ্ঞের গলায় বললে পরি, 'মানুষের শরীরে জলই তো বেশি। মানুষগুলোকে নিজের মধ্যে টেনে নিয়ে তাদের মেদ-মজ্জা-মাংস ক্যালরি দিয়ে নিজেকে আরও শক্তিমান করে তুলেছে। যেটা তার কাছে ছিবড়ে, সেটা ফেলে দিয়েছে। জল—জলই তার কাছে ছিবড়ে। এই জন্যে হাড় পাইনি, শরীরের চুল পর্যন্ত পাইনি, রয়েছে শুধু জল। বেশি জল যেখানে বেরিয়েছে সেখানে উবে যেতে সময় লেগেছে বলেই আমাদের চোখে পড়েছে। অল্প জল উবে গেছে।'



উতঙ্ক চৌধুরীর টেলিফোন এল টিকেন্দ্রনগর থেকে। কলকাতার এয়ারপোর্টে রিপোর্টাররা তাঁকে ছাড়েনি। জোঁকের মতন জেঁকে বসেছিল। নিরুপায় হয়ে উতঙ্ক চৌধুরী তাঁদের জানিয়েছিলেন রোয়ানোক আইল্যান্ডের কাহিনি, মায়া সভ্যতার অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা, সামুদ্রিক প্রাণীদের রহস্যজনক অন্তর্ধান উপাখ্যান, **১৭১১** সালে গোটা একটা সৈন্যবাহিনীর তিরোধান প্রহেলিকা। শুনে রোমঞ্চিত হয়েছে প্রতিটি সাংবাদিক। তাই দেখে উৎসাহিত হয়ে আরও কাহিনি শুনিয়েছেন উতঙ্ক চৌধুরী। এস্কিমোদের গ্রাম আঞ্জিকুনিতে **১৯৩০** সালের নভেম্বর মাসে পা দিয়ে হতভম্ব হয়ে গেছিলেন এক ফরাসী পণ্যব্যাবসায়ী। গ্রাম খাঁ-খাঁ করছে। জীবন্ত প্রাণী কেউ নেই, না মানুষ, না কুকুর। আধ-খাওয়া খাবার ফেলেও পালিয়েছে প্রত্যেকেই। কিন্তু পালাতে গেলে তো স্লেজগাড়ি চড়ে যাবে। গাড়িগুলো রয়েছে যথাস্থানে, নেই শুধু কুকুরগুলো যারা টেনে নিয়ে যায় স্লেজগাড়ি। তার মানে একটাই, আচমকা যেন বাতাসে গলে মিলিয়ে গেছে সমস্ত পশু আর মানুষ। কবরখানার দম আটকানো নীরবতা বুকে নিয়ে বিরাজ করছে
শূন্য গ্রাম।

রিপোর্টারদের অবহিত করার জন্যেই সবশেষে নিজের তত্ত্ব হাজির করেছিলেন উতঙ্ক চৌধুরী। রহস্যাবৃত এই সব ঘটনার মূলে রয়েছে আদিম শত্রু।

টেলিফোনে সুরেশ সাইকিয়া প্রথমেই বললেন, ‘আপনার ‘আদিম শত্রু’কে মনে হয় দেখলাম। অতিকায় অ্যামিবা বললেই চলে। যখন তখন চেহারা পালটাতে পারে, যে কোনও আকার ধারণ করতে পারে। কী, ঠিক বলেছি? এই কি আপনার ‘আদিম শত্রু’?’

‘হ্যাঁ। অতীতের কোনও এক যুগের বাসিন্দা কোনওমতে টিকে গেছে। লক্ষ কোটি বছর বয়স।’

টম ডিক্সন আর রমেশ থাপার বীভৎস মৃত্যুকাহিনির বর্ণনা দিয়ে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া। মৃত রমেশ থাপার ফিরে আসার কথাও বললেন। সবশেষে বললেন, ‘এরপরও কি আসতে চান?’

হতভম্ব কণ্ঠে বললেন উতঙ্ক চৌধুরী, ‘এত দেখেও বেঁচে আছেন?’

‘বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। যাতে আপনাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখানে এনে ফেলতে পারি।’

‘আপনার কথার মানে বুঝতে পারছি না। আমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওখানে নিয়ে ফেলতে চায় ‘আদিম শত্রু’?’

‘হ্যাঁ। নির্বিঘ্নে বেরিয়ে যেতে পারবেন শহর থেকে—এই অভয় আপনাকে দিয়েছে আপনার ‘আদিম শত্রু’।’

‘গ্যারান্টি?’

‘হ্যাঁ,’ বলে সুরেশ সাইকিয়া শোনালেন সেই অতীব বিস্ময়কর কাহিনি—কমপিউটারের মাধ্যমে আদিম শত্রুর সঙ্গে কথোপকথন।

শুনতে শুনতে ঘেমে গেলেন উতঙ্ক চৌধুরী। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপাল আর মুখ মুছলেন। তোতলাতে তোতলাতে বললেন, ‘ক-কখনও ভাবিনি—’ আর বলতে পারলেন না।

‘কী ভাবেননি?’

‘আদিম শত্রু যে কোনও মানুষের বুদ্ধির স্তরে পৌঁছোতে পারে কখনও ভাবিনি।’

‘অতি-মানুষের বুদ্ধির স্তরে পৌঁছে গেছে।’

‘আমি ভেবেছিলাম বোবা জন্তু, শুধু নিজেকে নিয়েই সজাগ।’

‘একদম না।’

‘তাই যদি হয়, বিপদ আরও বাড়ল।’

‘আসবেন কি?’

‘মুশকিলে ফেললেন।’

‘আসবেন কি না বলুন।’

‘সত্যিই যদি ইনটেলিজেন্ট হয় আদিম শত্রু, আমার ফিরে আসার গ্যারান্টি দেয়...’

টেলিফোনে শোনা গেল একটা শিশুকণ্ঠ, 'আসুন না কাকু, কত খেলব দু'জনে।'

উতঙ্ক চৌধুরী জবাব দেওয়ার আগেই ধ্বনিত হল এক নারীকণ্ঠ, 'ভয় নেই, ভয় নেই... চলে আসুন। যথাসময়ে ঠিক বের করে দেব শহর থেকে।'

পরমুহূর্তেই ধীর স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলে গেল এক বয়স্ক পুরুষ, 'ডক্টর চৌধুরী, অনেক খবর পাবেন আমার সম্বন্ধে। অনেক জ্ঞান, অনেক তথ্য। আসুন, দেখুন, জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করুন। নিরাপত্তার গ্যারান্টি মিথ্যে নয়, সশরীরে বেরিয়ে যাবেন শহর থেকে।'

আর কোনও শব্দ নেই টেলিফোনে। ঘাবড়ে গিয়ে বললেন উতঙ্ক চৌধুরী, 'হ্যালো... হ্যালো... এটা কি ইয়ার্কির সময়?'

ভেসে এল সুরেশ সাইকিয়ার কণ্ঠস্বর, 'না, ইয়ার্কি নয়। আপনি যা শুনলেন, আমিও তা শুনেছি। কথা আমি বলিনি, বলেছে আপনার আদিম শত্রু, যাদের গ্রাস করেছে, তাদের গলা নকল করে।'

দরদর করে ঘামছেন উতঙ্ক চৌধুরী। মানুষের গলায় কথা বলে গেল অ্যামিবা?

রুমাল দিয়ে ফের মুখ মুছলেন। বললেন কাঁপা গলায়, 'আমি যাব।'

'প্রাণ নিয়ে ফিরে যাবেন, সে গ্যারান্টি সত্যি নাও হতে পারে।'

'ইনটেলিজেন্ট প্রাণী যদি হয়—'

'ইনটেলিজেন্স অবশ্যই আছে, সেইসঙ্গে আছে অশুভ ইচ্ছে। শুভ বলতে যা বোঝায় এর মধ্যে তা নেই।'

সঙ্গে সঙ্গে ভেসে এল সেই শিশুকণ্ঠ, 'আসুন কাকু, আসুন। কোনও ভয় নেই। যদি আসেন, তাহলে শুধু আপনি নন—এই ছ'জনও প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে। আর যদি না আসেন, এদেরকে পিষে মারব, তারপর কাজে লাগাব—আমার কাজে।'

খুব মিষ্টি গলায় কথাগুলো বলা হলেও যে নিষ্ঠুর নির্মমতা ছিটকে ছিটকে গেল প্রতিটি শব্দ থেকে, তা আর এক দফা ঘামিয়ে দিল ডক্টর চৌধুরীকে। এবার শুধু ঘাম নয়, ধড়াশ ধড়াশ করছে হৃদ্‌যন্ত্র। কথা বললেন কিন্তু থেমে থেমে, 'আমি আসছি।'

বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'আমাদের জন্যে আসবেন না। আপনাকে ছেড়ে দেবার কারণ আছে। আপনি ওর জীবনী লিখবেন, গোটা পৃথিবীকে জানাবেন। তাই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। আমাদের প্রাণের কোনও দাম এর কাছে নেই।'

গোঁয়ারের মতো উতঙ্ক চৌধুরী বললেন, 'আমি যাচ্ছি।'

'ড্রাইভিং জানেন?'

'জানি।'

‘শিবালয়ের বর্ডারে আপনাকে ছেড়ে দেবে একটা গাড়ি। আমাদের অন্য গাড়ি ওখানেই আছে। আপনি নিজে চালিয়ে আসবেন। রাজি?’

‘রাজি।’



শিবালয় শহরের শিব মন্দিরের ঘণ্টা বেজে উঠল রাত ঠিক তিনটে বেজে বারো মিনিটের সময়ে। বেজেই চলল ঢং ঢং করে।

হোটেলের লবিতে বসেছিল ছ'জনে। একই সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল তৎক্ষণাৎ। ককিয়ে উঠল সাইরেন। বেজেই চলেছে... দমকে দমকে যেন হাহাকার ছেড়ে যাচ্ছে।

বললে মাধবী, 'উতঙ্ক চৌধুরী আসছেন মনে হচ্ছে।'

ছ'জনে বেরিয়ে গেল বাইরে।

শিবালয় শহরের নিচের দিকে কোণ ঘুরে আবির্ভূত হল একটা গাড়ি। হেডলাইটের আলো উঠে রয়েছে ওপর দিকে। রুপোলি চেকনাই জাগছে কুয়াশার পর্দায়।

ঢালু রাস্তা বেয়ে ধীর ধীরে উঠে আসছে গাড়ি। ব্রেক কষল ফুটপাত ঘেঁষে—সুরেশ সাইকিয়া যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে দশ ফুট দূরে। নিভে গেল হেডলাইট।

খুলে গেল ড্রাইভারের দরজা। নেমে এলেন উতঙ্ক চৌধুরী। পুরু চশমার লেন্সের মধ্যে দিয়ে ভদ্রলোকের চোখ দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড় মনে হচ্ছে। সাদা চুল এলোমেলোভাবে লেপটে রয়েছে কপাল আর কানের ওপর। হেড কোয়ার্টার থেকে এনেছেন একটা ইনসুলেটেড জ্যাকেট—গায়ে চাপানোর ফলে আরও বেঢপ হয়েছে আকৃতি।

স্তব্ধ হল ঘণ্টাধ্বনি। গোঁ-গোঁ করতে করতে থেমে গেল সাইরেন। এরপরের নৈঃশব্দ্য বর্ণনারও বাইরে।

এগিয়ে এলেন উতঙ্ক চৌধুরী, 'সুরেশ সাইকিয়া?'

'হ্যাঁ, আমি। চলুন, ভেতরে বসে কথা হবে।'

ছ'জোড়া চোখ নিবদ্ধ উতঙ্ক চৌধুরীর ওপর। তিনি বলে চলেছেন পৃথিবীর কোন কোন জায়গা থেকে অতর্কিতে রাতারাতি কীভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে মানুষ আর জন্তু।

বললেন, দক্ষিণ আমেরিকার জয়া ভার্দি শহরের অবিশ্বাস্য কাহিনি। আমাজন নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছিল এই ব্যাবসা কেন্দ্র। বাচ্চাকাচ্চা নারীপুরুষ মিলিয়ে সেখানে মানুষ ছিল ছ'শো পাঁচজন। সব্বাই অদৃশ্য হয়ে গেল এক অপরাহ্নে। মিশন স্কুলে ব্ল্যাকবোর্ডে চকখড়ি দিয়ে শুধু লেখা ছিল: *এর কোনও আকার নেই—অথচ সবরকম আকার ধারণ করতে পারে।*

কথাটার মানে কী হতে পারে, তা বুঝেছিলেন শুধু উতঙ্ক চৌধুরী। কেননা, তিনি যে জানেন, সুপ্রাচীন মায়াশহরেও পাওয়া গেছে অনুরূপ একটা বার্তা। রাতারাতি মায়াশহর পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার সময়ে লেখা হয়েছিল সেই বার্তা: অশুভ দেবতারা রয়েছে এই পৃথিবীতে। তারা ঘুমিয়ে আছে পাহাড়-পর্বতে। ঘুম ভাঙলে তারা লাভাস্রোতের মতন বয়ে যায়—শীতল লাভা—বহু আকার ধারণ করতে পারে। গ্রাস করে ধনী মানী দরিদ্রকেও, রেখে যায় না কোনও চিহ্ন।

বললেন উতঙ্ক চৌধুরী, 'যে সবকিছু গ্রাস করে নেয় কোথাও কোনও চিহ্ন না রেখে সে 'আদিম শত্রু' ছাড়া কেউ নয়।'

জানালেন সুরেশ সাইকিয়া, 'এখানেও পেয়েছি একটা মেসেজ। একটা শব্দের কিছুটা।'

'আধখানা শব্দ?' উৎসুক হলেন উতঙ্ক চৌধুরী।

'হ্যাঁ,' বলে গেল মাধবী, 'এক প্রৌঢ়া মেমসাহেব দেওয়ালে আয়োডিন দিয়ে P R O লিখেছেন—এর আধখানা—হলেও হতে পারে।'

'মেমসাহেব?' কৌতূহলে ফেটে পড়লেন উতঙ্ক চৌধুরী, 'নিশ্চয় গ্রীসদেশের।'

হাঁ হয়ে গেল মাধবী, 'জানলেন কী করে?'

'প্রাচীন গ্রীসদেশে Proteus নামে এক উপদেবতা ছিল। আর নিবাস মাটিতে। নিজস্ব চেহারা বলতে কিছুই ছিল না। ইচ্ছেমতো যে কোনও মূর্তি ধারণ করতে পারত, যাকে খুশি তাকে খেতে পারত।'

তিক্ত স্বরে বলে উঠলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'আপনি বৈজ্ঞানিক হয়ে এই সব অলৌকিক কুসংস্কার কাহিনিতে বিশ্বাস করেন?'

'অবশ্যই করি। আপনাকেও করতে হবে। নিজের চোখে তো দেখেছেন যার কোনও মূর্তি নেই, সে ইচ্ছেমতো যে কোনও মূর্তি ধারণ করতে পারে। পুরাকালে একেই বিভিন্ন উপদেবতা নামে ডাকা হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত দেশের সমস্ত পুরাণ কাহিনিতে এই ধরনের অদ্ভুত উদ্ভট উপদেবতার শারীরিক বর্ণনা পাবেন। দু'পাতা বিজ্ঞান পড়ে সব কিছুই আমরা উর্বর কল্পনাপ্রসূত বলে মনে করে এসেছি। কিন্তু এরা সব্বাই ছিল, এখনও আছে। আমাদের আদিম আতঙ্ক।

অপরাজিতা সোম বললেন, 'ডক্টর চৌধুরী, যা বলে গেলেন, বৈজ্ঞানিক শব্দে যদি তা বলতেন, উপকৃত হতাম, কিন্তু আপনি এখনও বলেননি, জীববিজ্ঞানের শর্ত মেনে এ-প্রাণী নিজেকে টিকিয়ে রেখেছে কীভাবে। আমি শুনতে চাই আপনার বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদ, আপনার তত্ত্ব।

উতঙ্ক চৌধুরী জবাব দেওয়ার আগেই, 'সে' নিজে এল।

ডাইনিং রুমের বেসিনের কল ছিটকে বেরিয়ে এসে খটখটিয়ে গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর দিয়ে। কল-হীন পাইপের মধ্যে দিয়ে সে বেরিয়ে এল গলগল করে অবিরাম স্রোতের আকারে। বেসিন ভরিয়ে গড়িয়ে গেল মেঝের ওপর। দেখতে দেখতে একমানুষ... দু'মানুষ... হাতির মতন দেখতে পেল্লায় আকার ধারণ করে কড়িকাঠ ছুঁয়ে ফেলল অবর্ণণীয় জেলিগোলক... ফুঁসছে... ফুলছে... ঘুরপাক খাচ্ছে...

আচমকা অনেকগুলো সরু মোটা শুঁড় বেরিয়ে এল জেলিপিণ্ড থেকে। একটা নিজেকে বাড়িয়ে ধরল সাতজনের দিকে। সাতজনেই তখন চেয়ার ছেড়ে দেওয়ালের গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। শুঁড়টা এগিয়েই থমকে গেল মাঝপথে। শুঁড়ের ডগায় আবির্ভূত হল ছোট্ট একটা ছেঁদা... টপটপ করে জলীয় পদার্থ বেরিয়ে এসে পড়ল মেঝেতে। হলুদ রঙের তরল আরক।

যেখানে যেখানে পড়ল, ধোঁয়া উঠতে লাগল সেইখান থেকে, ফুটো হয়ে যাচ্ছে সিমেন্টের মেঝে। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললে মাধবী, 'অ্যাসিড।'

মাধবীর এই আত্মজ্ঞানটার জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল লকলকে শুঁড়। ওর মুখের কথা শেষ হতে না হতেই সপাং সপাং করে দু'বার আছড়ে পড়ল টেবিল আর চেয়ারের ওপর। খান খান হয়ে গেল অতবড় টেবিল আর সব ক'টা চেয়ার। তারপরই শূন্যপথে অ্যাসিড ঝরাতে ঝরাতে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

পরি জড়িয়ে ধরেছে মাধবীকে। সুরেশ সাইকিয়া এক হাত রেখেছেন হোলস্টারের রিভলভারে—টেনে বের করা সাহস নেই। অপরাজিতা সোমের মুখ ছাইয়ের মতন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। উতঙ্ক চৌধুরী ফ্যালফ্যাল করে চেয়েই আছেন—চোখের পাতা

ফেলতে ভুলে গেছেন। বিশু বোস আর উজাগর সিং নিথর চোখে দেখছেন লকলকে শুঁড় টিপ করেছে কার দিকে।

দুজনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশাপাশি। শুঁড় এসে থেমে গেল বিশু বোসের নাকের সামনে—মাত্র এক ইঞ্চি দূরে। পরক্ষণেই সরে গেল পাশে। পাক দিল উজাগর সিং-এর গলায়। নিমেষে টেনে নিয়ে গেল ঘরের মাঝখানে।

বিকট আর্তনাদ করে উঠেছিল উজাগর সিং। দু'হাতে শুঁড় জাপটে ধরেছিল। এক ঝটকায় তার গোটা শরীরটা উঠে গেল শূন্যে। দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে এল কোটর থেকে। বিরামবিহীন রক্ত-জল-করা চিৎকারে বুঝি কেঁপে কেঁপে উঠল গোটা শিবালয় শহর।

ঢোক গিলে বললে মাধবী, 'আহার্য নিবাসে' কাটামুণ্ড তৈরি হয়েছিল কীভাবে তা দেখাচ্ছে—অ্যাসিড দিয়ে।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উজাগর সিং এর মুণ্ডটা সশব্দে আছড়ে পড়ল মেঝেতে। শুধু কবন্ধ দেহ ঝুলতে লাগল শূন্যে। পরমুহূর্তে কবন্ধও অদৃশ্য হয়ে গেল জেলিপিণ্ডর মধ্যে।

জেলিপিণ্ড এখন নব কলেবর ধারণ করছে অতিকায় মানুষ। দানব।

শুকনো গলায় বললেন অপরাজিতা সোম, 'টিসু স্যাম্পেল যদি একটু পেতাম, মাইক্রোসকোপে দেখে নিতাম কোষের গড়ন। খতম করার অস্ত্র বের করা যেত।'

দানব বললে বজ্রকণ্ঠে, 'ডক্টর উতঙ্ক চৌধুরী, ল্যাবরেটরিতে যান। আমার জীবনী লিখবেন, সব না জানলে লিখবেন কী করে?'

দানব শরীর থলথলে হয়ে গেল নিমেষে। আবার দেখা গেল জেলিপিণ্ড। সরু হয়ে পাইপের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যে রইল না কিছুই।

উজাগরের মুণ্ডটা ছাড়া।

রাত তখন তিনটে বেজে চুয়াল্লিশ মিনিট।

সেকেন্ড ল্যাবরেটরির দরজা দু'হাট করে খোলা রয়েছে। ছ'জন ঠেসাঠেসি করে ঢুকেছে তার মধ্যে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বাইরে চোখ রেখেছেন বিশু বোস। কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সুরেশ সাইকিয়া আর মাধবী। তিনটে উজ্জ্বল ভিডিয়ো ডিসপ্লে টার্মিনালের সামনে বসে উতঙ্ক চৌধুরী, অপরাজিতা সোম আর পরি।

কমপিউটার স্ক্রিনে কথা ফুটে উঠল—*পাঠালাম একটা মাকড়সা।*

'মানেটা কী?' বলে উঠলেন উতঙ্ক চৌধুরী।

স্ক্রিনে ফুটল নতুন লেখা—*পেছনে দেখ। পরীর পেছনে।*

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল পরি। ঘুরে দাঁড়িয়েই দেখল বিরাট একটা মাকড়সা। কুচকুচে কালো। স্থির হয়ে মেঝেতে দাঁড়িয়ে। এতগুলো মানুষের লাফিয়ে ঘুরে দাঁড়ানো তাকে চঞ্চল করেনি।

কিন্তু পরিবর্তনটা ঘটল চোখের সামনে, খুব দ্রুত। লম্বা ঠ্যাংগুলো ঢুকে গেল শরীরের মধ্যে। এখন সে একটা ডেলা ছাড়া কিছুই নয়। কালচে রং পালটে গিয়ে হয়ে গেল ধূসর-লাল। মাকড়সা আকৃতি বিলীন হয়েছে থসথসে জেলিপিণ্ডর মধ্যে। চকিতে জেলি নিল নতুন আকার—আরশোলা হয়ে গেল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, আরশোলা ফের জেলি হয়ে গিয়েই হয়ে গেল নেংটি ইঁদুর।

ভিডিয়ো ডিসপ্লেতে ফুটে উঠল নতুন লেখা—*ডক্টর অপরাজিতা সোম, টিসু স্যাম্পেল চেয়েছিলে, পাঠিয়ে দিলাম।*

বিশু বোস বললেন, ‘হঠাৎ এত সদয় হয়ে উঠল কেন?’

বিষন্ন কণ্ঠে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘কারণ ও জানে, ওকে খতম করার হাতিয়ার বার করার এলেম আমাদের নেই।’

মুহূর্তের জন্যেও স্থির নেই জেলিপিণ্ড, ফুঁসছে, ফুলছে, টোল খাচ্ছে, তেউড়ে যাচ্ছে।

স্ক্রিনে ফুটে উঠল শব্দের পর শব্দ:

চোখ মেলে দেখে নাও আমার শরীরের মাংসখণ্ডর অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ। এই ক্ষমতা আর অমরত্ব শুধু আছে আমার মধ্যেই। আমি অবিনশ্বর। আমি মৃত্যুঞ্জয়ী। আমি সর্বরূপী। আমি সর্বত্র বিরাজমান। আমি সর্বজ্ঞ। ছুঁয়ে দেখ—কোনও ভয় নেই।

সাহসে বুক বেঁধে হেঁট হলেন অপরাজিতা সোম। তর্জনী বাড়িয়ে ডগা দিয়ে স্পর্শ করলেন স্পন্দিত জেলিপিণ্ডকে। বললেন, দরকার তো একটু টুকরোর।

‘লাইট মাইক্রোসকোপির জন্যে,’ সায় দিল মাধবী।

‘সেই সঙ্গে ইলেকট্রন মাইক্রোসকোপের জন্যে। আরও একটু বেশি দরকার কেমিক্যাল আর মিনারেল বিশ্লেষণের জন্যে।’

দপদপ করে লেখা ফুটে উঠেই নিভে যেতে লাগল পরম উল্লাসে: *চালাও... চালাও... চালাও এক্সপেরিমেন্ট।*

ওয়ার্ক কাউন্টারে মাইক্রোসকোপ নিয়ে বসে আছেন অপরাজিতা সোম। বললেন অস্ফুট স্বরে, ‘অবিশ্বাস্য!’

মাধবী বসে তার পাশেই আর একটা মাইক্রোসকোপ নিয়ে। তার স্বরেও জাগল বিস্ময়, ‘এরকম কোষ-গঠন কখনও দেখিনি।’

উতঙ্ক চৌধুরী জীববিজ্ঞানী নন। কোষ-গঠনের ব্যাপারে জ্ঞানদান করতে অক্ষম। তাই শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'অবাক হচ্ছেন কেন?'

অপরাজিতা সোম বললেন, 'বেশির ভাগ টিসুতেই কোষের গঠন নেই।'

মাধবী বললে, 'আমার স্যাম্পেলেও দেখছি একই ব্যাপার।'

'অথচ জৈব বস্তুতে কোষ-গঠন থাকে—থাকতেই হবে।'

'স্যাম্পেল দেখে তো মনে হচ্ছে অজৈব বস্তু। কিন্তু তা হওয়া তো উচিত নয়।'

'তা তো নয়ই,' বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'এ যে কতখানি জ্যান্ত, তা তো চোখে দেখেছি, হাড়ে হাড়ে বুঝেছি।'

অপরাজিতা সোম বললেন, 'কয়েকটা কোষ রয়েছে আমার স্যাম্পেলে—কিন্তু একটা আর একটা থেকে আলাদা।'

সায় দিয়ে গেল মাধবী, 'আমিও তো তাই দেখছি। রকমারি কোষ যেন সাঁতরে বেড়াচ্ছে অথই অজানা সমুদ্রে।'

অপরাজিতা সোম বললেন, 'কোষের দেওয়াল তো ঘনঘন পালটে যাচ্ছে নিউক্লিয়াসের রয়েছে তিনটে দাড়া। কোষের ভেতরে প্রায় অর্ধেক জায়গা জুড়ে রয়েছে। রহস্যময়।'

তিনটে কমপিউটারের স্ক্রিনেই একই সঙ্গে ফুটে উঠল একই কথা:

উজবুক কোথাকার! সর্বশক্তিমানের কোষ তো রহস্যময় হবেই।

স্যাম্পেলের অর্ধেক নিয়ে অপরাজিতা ও মাধবী পরীক্ষা করছিল। বাকি অর্ধেক ছিল একটা কাচের ডিশে। ঘনঘন কাঁপছিল সেই নমুনা। চেহারা পালটে উদ্ভট কীটপতঙ্গ হয়েই ফের জেলির আকারে ফিরে যাচ্ছিল।

অপরাজিতা সোম বললেন, 'একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি। এই যে স্বরূপহীন টিসু, এই টিসু যখন খুশি যেরকম খুশি কোষ নকল করতে পারে। কিন্তু ওই যে ছাড়াছাড়া তিনটে দাড়াওয়ালা নিউক্লিয়াসের যে কোষ, ওইগুলোই কনট্রোল করছে সবকিছু। নিয়ন্ত্রণের হুকুম যাচ্ছে ওই কোষগুলো থেকেই, কীভাবে তা বলতে পারব না। স্বরূপহীন টিসু যখন কুকুরের চেহারা নিচ্ছে—তখন কুকুরের শরীরের কোষ গড়ে নিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু মাঝে সাঝে কয়েকটা ওই কোষ থাকছে, যাদের নিউক্লিয়াসের দাড়ার সংখ্যা তিন। যে কোষের দেওয়াল বেজায় নরম—স্থিতিশীলতা একদম নেই বললে চলে।'

'তা থেকে কী বোঝা গেল?' এতক্ষণে একটা প্রশ্ন নিক্ষেপ করলেন উতঙ্ক চৌধুরী।

'আদিম শত্রু যখন জিরোয়, তখন তার টিসুর মধ্যে নিজের কোনও কোষ থাকে না, আর যখন জাগে, তখন ছড়ানো ছিটোনো ত্রিদাড়া বিশিষ্ট কোষগুলো যেভাবেই

হোক এনজাইম বানিয়ে নেয়... কেমিক্যাল সিগন্যাল পাঠায়... স্বরূপহীন টিসুকে নিয়ন্ত্রণ করে।

'শয়তানের নিধনের পন্থা কি বের করা গেল?' খোঁচা দাড়ি চুলকে বললেন উতঙ্ক চৌধুরী।

'না,' সাফ জবাব দিলেন অপরাজিতা সোম।

কাচের ডিশে দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে চেহারা পরিবর্তন।

'ব্রেন আছে কি?' মাধবীর প্রশ্ন, 'ধীশক্তির একটা কেন্দ্র নিশ্চয় আছে 'আদিম আতঙ্ক' নামক এই মহাপ্রভুর।'

'ধরেছেন ঠিক। আমাদের ব্রেনের মতন না হলেও ওই জাতীয় কিছু একটা রয়েছে নিশ্চয়। যে জিনিসটা কন্ট্রোল করছে বিক্ষিপ্ত কোষদের, কোষগুলো কন্ট্রোল করছে নিরাকার প্রোটোপ্লাজম।'

উত্তেজিত হয়ে যায় মাধবী, 'তাই যদি হয়, তাহলে বিক্ষিপ্ত কোষদের সঙ্গে ব্রেনের কোষদের একটা জায়গায় মিল থাকবেই। চেহারা পালটাচ্ছে না কেউই।'

'যুক্তির দিক থেকে হক কথা বলেছেন। যে-কোষ হরদম চেহারা পালটায়, সে কোষ স্মৃতি, ধীশক্তি, যুক্তিশক্তির ভাঁড়ার হয়ে থাকতে পারে না। সিদ্ধান্তটা দাঁড়াচ্ছে এই—এগুলো জমা আছে যেখানে সে জায়গাটা স্থায়ী কোষদের মজবুত গঠন।'

মোলায়েম গলায় বললে মাধবী, 'ব্রেনে তাহলে আঘাত হানা যায়। ব্রেন যখন স্বরূপহীন টিসু দিয়ে তৈরি নয়, তখন তা জখম হলে নিজেই নিজেকে মেরামত করে নিতে পারবে না। স্থায়ীভাবে জখম হবে ব্রেন। জখম যদি ভালোভাবে করা যায়—অনেকখানি জায়গা জুড়ে করা যায়, তাহলে শরীর গড়া হয়েছে যে স্বরূপহীন টিসু দিয়ে, তাদের কন্ট্রোল করতে পারবে না, তার মানে, মৃত্যু হবে শরীরের।'

বিস্ফারিত চোখে মাধবীর পানে চেয়ে রইলেন অপরাজিতা সোম, 'ইউ আর রাইট।'

'অত উল্লসিত হবার কারণ দেখছি না,' বিরসবদনে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, 'আদিম আতঙ্ক নামক এই প্রাণী এত বোকা নয় যে, ব্রেনকে এমন জায়গায় রেখে দিয়েছে যেখানে পৌঁছে যাবে আমাদের গুলিগোলা। ব্রেন আছে আমাদের নাগালের বাইরে—খুবই সুরক্ষিত জায়গায়... পাতালের সুগভীর কোনও গুহায়।'

নিভে গেলেন অপরাজিতা সোম, মন দিলেন টিসু স্যাম্পেলের কেমিক্যাল আর মিনারেল বিশ্লেষণের ফলাফলের দিকে। বললেন, 'বহু রকমের হাইড্রোকার্বন রয়েছে দেখছি। কয়েকটা রয়েছে কণা পরিমাণে। হাইড্রোকার্বন দিয়ে ঠাসা। এমন তো দেখা যায় না।'

‘কার্বন কিন্তু সজীব টিসুর মৌলিক উপাদান। সুতরাং তফাতটা কোথায়?’ মাধবীর প্রশ্ন।

‘পরিমাপে। স্বাতন্ত্র্য মাত্রায়, এত রকমের হাইড্রোকার্বন এত অধিক পরিমাণে থাকাটা খুবই অস্বাভাবিক।’

‘তাতে কি আমাদের লাভ হচ্ছে?’

‘বুঝতে পারছি না,’ চিন্তাক্লিষ্ট চোখে বিশ্লেষণের ফলাফলের দিকে চেয়ে রইলেন অপরাজিতা সোম।

কাচের ডিশে ঘন ঘন রূপ পরিবর্তন করছে জেলিপিণ্ড। ফড়িং। শুঁয়োপোকা। পিঁপড়ে। মাকড়সা... একদৃষ্টে দেখে যাচ্ছে পরি।

‘পেট্রোলেটাম,’ বললেন অপরাজিতা সোম।

‘সেটা কী?’ সুরেশ সাইকিয়া উদগ্রীব হলেন।

‘পেট্রোলেটাম জেলি।’

‘ভেসেলিনের মতন?’

উতঙ্ক চৌধুরীর প্রশ্ন, ‘স্বরূপহীন টিসু কি পেট্রোলেটাম?’

‘না, না, না,’ জোরে মাথা নাড়লেন অপরাজিতা সোম, ‘মোটেই তা নয়। এ জেলি তো সজীব টিসু। কিন্তু হাইড্রোকার্বনের অনুপাতে সাদৃশ্য রয়েছে। পেট্রোলেটামের গঠনের চেয়ে অনেক বেশি জটিল এই টিসুর গঠন। মানুষের শরীরে খনিজ দ্রব্য আর রাসায়নিক দ্রব্য যত আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি রয়েছে এই টিসুর মধ্যে। অ্যাসিড আর অ্যালকালির পঙ্‌ক্তি লক্ষণীয়... এদেরকে পুষ্টির কাজে লাগায় কীভাবে, ভেবে পাচ্ছি না... শ্বাসপ্রশ্বাস চালায় কীভাবে... রক্তসংবহনতন্ত্র নেই—অথচ সজীব রয়েছে কী করে... স্নায়ুতন্ত্র তো চোখে পড়ছে না—অথচ স্নায়ুর কাজ দিব্যি চলছে... কোষের নির্দিষ্ট গঠন বা আকার নেই অথচ নতুন টিসু গড়ছে কী করে! সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অতিরিক্ত মাত্রার হাইড্রোকার্বন...’

শেষের দিকে কথা ক্ষীণ হয়ে এল অপরাজিতা সোমের, শূন্য হয়ে এল চাহনি। চেয়ে আছেন টেস্ট রেজাল্টের দিকে কিন্তু কিছুই আর দেখছেন না।

ঠিক এই সময়ে শোনা গেল পরির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, ‘আসুন, আসুন দেখবেন আসুন।’

কাচের ডিশের দিকে চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে পরি—এতক্ষণ জেলিদেহ দ্রুত রূপ পালটে যাচ্ছিল এই ডিশে। অকস্মাৎ থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে গেল জেলি—সাদাটে তরল পদার্থ বেরিয়ে এল তার গা থেকে। এখন তা নিষ্প্রাণ। নড়ছে না। অন্য মূর্তি ধারণ করছে না।

চামচে দিয়ে খোঁচা মারলেন অপরাজিতা সোম। নিষ্প্রাণ জেলি-জলীয় নড়েচড়ে গেল না। চামচে দিয়ে ঘেঁটে দিলেন। আরও পাতলা হয়ে গেল টিসু—কিন্তু সাড়া দিল না, নরম গলায় বললেন উতঙ্ক চৌধুরী—'মৃত্যু' এর নাম মৃত্যু।

যেন তড়িতাহত হলেন সুরেশ সাইকিয়া। তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন অপরাজিতা সোমকে, 'ডিশে স্যাম্পেল রাখবার আগে কী রেখেছিলেন?'

'কিচ্ছু না।'

'নিশ্চয় কিছু ছিল। ভাবুন, ভাবুন। আমাদের জীবন নির্ভর করছে আপনার মনে করার ওপর।'

'বলছি তো কিছু ছিল না।'

'কোনও কেমিক্যালের তলানি?'

'পরিষ্কার করা ডিশ। তলানি ছিল না।'

'হতেই পারে না। এমন কিছু ছিল ডিশে যার ছোঁয়ায় 'আদিম শত্রু'র দেহাংশ পঞ্চত্ব লাভ করেছে,' সুরেশ উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছেন।

'সেই জিনিসটাই আমাদের হাতিয়ার,' নিষ্কম্প স্বরে বলে গেলেন বিশু বোস।

'অত সোজা নয়,' নিরুত্তাপ গলায় বললেন উতঙ্ক চৌধুরী, 'আমরা সকলে দেখেছি—ইচ্ছে মতন স্বরূপহীন শরীরের খানিকটা আলাদা করে অন্য চেহারা ধারণ করার জন্যে পাঠিয়ে দিতে পারে 'আদিম শত্রু'। মূল শরীর থেকে আলাদা হয়ে ওই টুকরো শরীর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং কেমিক্যাল অস্ত্র দিয়ে তার স্বরূপহীন শরীরের খানিকটা ধ্বংস যদি করি—'আদিম শত্রু' নিমেষে জখম অংশ ফেলে দিয়ে বাঁচিয়ে নেবে নিজেকে।'

মাধবীর রোখ চেপে গেল, 'এটাও তো ঠিক যে, 'আদিম শত্রু'র অংশবিশেষ নিজেই নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারে না। বিশেষ কতগুলো কোষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় এনজাইম সাপ্লাই পায় বলেই কাজ করতে পারে। 'আদিম শত্রু' তার পুরো অবয়বকে কব্জায় রেখেছে এই এনজাইম দিয়ে। কিন্তু তা কীভাবে?'

'ব্রেনের সাহায্যে,' আস্তে বললেন অপরাজিতা সোম। 'মানুষের ব্রেন এনজাইম আর হরমোন তৈরির গ্রন্থিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করছে বলেই মানুষের শরীর চালু রয়েছে। 'আদিম শত্রু'র ব্রেনও নিশ্চয় সেই একই কাজ করে চলেছে।'

সুরেশ সাইকিয়া বললেন, 'বুঝলাম। কিন্তু এই আবিষ্কারটা আমাদের কী কাজে লাগবে জানতে পারি?'

জবাবটা দিল মাধবী, 'ব্রেনকে ধ্বংস করতে পারলেই 'আদিম শত্রু' তার শরীরকে টুকরো টুকরো করেও আলাদা অংশগুলোকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না।'

‘ব্রেনটা কোথায় সেটাই জানা নেই যখন, এ আবিষ্কার কোনও কাজেই লাগবে না,’ সুরেশ সাইকিয়া যেন হতাশ হলেন।

‘অত হতাশ হবেন না,’ মুখে হাসি টেনে এনে বললেন অপরাজিতা সোম, ‘ডিশের জেলির মৃত্যু থেকে একটা তথ্য তো জানা গেল।’

‘কী তথ্য?’

‘একটা রাসায়নিক ভারসাম্য বজায় রাখতে পারলেই স্বরূপহীন শরীর বেঁচে থাকে—নইলে মরে।’

সুরাহার ক্ষীণ একটা আশা অপরাজিতা সোমের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে কিন্তু তা নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলা মানেই ‘আদিম শত্রু’র গোচরে এনে ফেলা। সে ঠিক জানবেই। তার চাইতে সমাধানসূত্র থাকুক মগজের মধ্যে।

তাঁকে এখনই একটা জরুরি ফোন করতে বেরুতে হবে।



টেলিফোনে আর্মির এক ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললেন অপরাজিতা সোম। যা যা ঘটছে, সংক্ষেপে বলে গেলেন। আগাগোড়া বুঝলেন, 'আদিম শত্রু' শুনছে প্রতিটি কথা। টেলিফোনে শোনা যাচ্ছে খুব অল্প হিসহিস আওয়াজ। তাই কতকগুলো যন্ত্রের অর্ডার দিয়ে গেলেন। কোত্থেকে পাওয়া যাবে। তাও বলে গেলেন। কীভাবে পাঠাতে হবে সে বিষয়েও নির্দেশ দিলেন। গাড়ি করে অবশ্যই নয়—আদিম শত্রুর খপ্পরে পড়তে পারে। হেলিকপ্টারে করে নামিয়ে দিতে হবে শিবালয় শহরে হোটেলের সামনে।

সবশেষে বললেন, 'ডক্টর চঞ্চল চক্রবর্তীর আবিষ্কারটা পাঠাবেন—তিন টিন।'

সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে এল আর্মি হেলিকপ্টার। তখন আকাশে সূর্য উঠে পড়েছে। অপরাজিত সোম টেলিফোনে কিছু খুলে না বললেও আর্মির অধিকর্তারা বুঝে নিয়েছিলেন, এত যন্ত্রপাতির আদৌ কোনও দরকার নেই তাঁর। সবই ধোঁকাবাজি। দরকার ওই তিনটে টিন, যার মধ্যে আছে ডক্টর চঞ্চল চক্রবর্তীর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার।

দূরে হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনেই পথে বেরিয়ে এল ছ'জনে। সুরেশ সাইকিয়া সবাইকে নিয়ে রাস্তার মাঝখানে হাত ধরাধরি করে গোল চক্র তৈরি করে ফেললেন। হেলিকপ্টার থেকে দড়ির ডগায় ঝুলিয়ে দেওয়া হল একটা মস্ত পুলিন্দা। সেটা ভূমি স্পর্শ করতেই দৌড়ে গেলেন সুরেশ সাইকিয়া। পুলিন্দার আংটায় লাগানো আঁকশি

খুলে দিলেন। সাঁ করে দড়ি উঠে গেল ওপরে। কাত হয়ে ঝড়ের বেগে শিবালয়ের মাথার ওপর দিয়ে চম্পট দিল হেলিকপ্টার। অপরাজিতা সোমের শরীর অপরিসীম ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে কিন্তু বাঁচার তাগিদে তিনি মরিয়া হয়ে উঠেছেন। নানান যন্ত্রপাতির মধ্যে থেকে তিনটে স্প্রেগান বের করলেন। মামুলি গান নয়। এরোসল ট্যাঙ্ক স্পেয়ার। হাতে পাম্প করতে হয় না। সিলিন্ডারে ঠেসে রাখা বাতাস স্প্রে করিয়ে দেয়। প্রত্যেকটা ট্যাঙ্ক পিঠে ঝুলিয়ে নেওয়া যায় বেল্ট দিয়ে। হাতে থাকে নমনীয় রবারের হোসপাইপ, যার শেষে রয়েছে চার ফুট লম্বা ধাতুর তৈরি স্প্রেগান। বারো থেকে চোদ্দো ফুট দূরেও স্প্রে করে দেওয়া যায়।

একটা তুলে নিলেন অপরাজিতা সোম। আর্মির লোক বুদ্ধিমান। ট্যাঙ্কের মধ্যে ডক্টর চঞ্চল চক্রবর্তীর আবিষ্কার ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাই এত ভারী। তিনটে আলাদা টিনে রয়েছে সেই একই আবিষ্কার।

ভয়-ভয় চোখে চারপাশ দেখে নিলেন অপরাজিতা সোম। 'আদিম আতঙ্ক'র ছায়াপাত ঘটেনি কোথাও। তবে অণু-পরমাণুতে যে-রকম শিহরণ জাগছে, মনে হচ্ছে তার আবির্ভাবের আর বেশি দেরি নেই।

ঝটিতি বললেন মাধবী, সুরেশ সাইকিয়া আর বিশু বোসকে, 'বড্ড ভারী, আমি বইতে পারব না। আপনারা একটা করে নিন, কাঁধে ঝোলান। ডক্টর লাহা, প্লীজ, আপনি মেয়ে হলেও গায়ে জোর রাখেন। কুইক।'

আধ মিনিটও গেল না। তিনটে ট্যাঙ্ক ঝোলানো হয়ে গেল তিনজনের পিঠে। হাতে রইল স্প্রেগান, আঙুল রইল ট্রিগারে।

জিজ্ঞেস করলেন সুরেশ সাইকিয়া, 'কী করতে হবে?'

'স্বরূপহীন যে শরীরেই অ্যাটাক করতে আসুক না কেন, গায়ে ছিটকে দেবেন।'

'তাতে কী হবে?'



'কাচের ডিশে যে দৃশ্য দেখেছিলেন, তাই দেখবেন। মৃত্যু।'

অপরাজিতা সোমের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ম্যানহোলের ঢাকনি ছিটকে গেল শূন্যে। অতিকায় অজগরের মতন সরীসৃপ দেহ বিদ্যুৎবেগে উঠে এসেই ধেয়ে এল অপরাজিতা সোমের দিকে। লকলকে একটা শুঁড় তার গলা পেঁচিয়ে ধরতেই স্প্রেগান তুলে সমানে পিচকারি চালিয়ে গেছিলেন সুরেশ সাইকিয়া। কিন্তু বিষম আক্রোশে ততক্ষণে অপরাজিতা সোমের কাটা মুণ্ড গড়িয়ে গেছে রাস্তায়।

অতিকায় সরীসৃপও অক্ষত নেই। ট্যাঙ্ক নিঃসৃত হলুদ তরল যেখানে যেখানে লেগেছে, সেখানে সেখানে ক্ষত সৃষ্টি হয়ে চলেছে—সাদাটে তরল গড়িয়ে পড়ছে।

আচমকা ম্যানহোলের বাইরে যেটুকু অংশ তাণ্ডব নৃত্য দেখিয়ে গেল সেইটুকু অংশ রইল বাইরেই, নিস্তেজ অবস্থায়। বাকি অংশ অন্তর্হিত হল ম্যানহোলের মধ্যে।

সুরেশ সাইকিয়া লাফিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন খোলা ম্যানহোলের সামনে। হেঁট হয়ে দেখলেন স্বরূপহীনের দানবিক জেলি। চকিতে স্প্রেগানের চোঙা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে ট্রিগার, টিপে রইলেন।

স্প্রে করার ফলে ভেতরে কী হচ্ছে, তা আর দেখতে পেলেন না। তবে টের পেলেন পায়ের তলায়, রাস্তা দুলছে। গোটা রাস্তা উঠছে আর নামছে। প্রচণ্ড চাড় দেওয়া হচ্ছে ভেতর থেকে।

কানফাটানো শব্দে লম্বালম্বিভাবে ফেটে গেল রাস্তা। রাস্তার তলায় টানেল বরাবর ওপরকার রাস্তা আর আস্ত নেই। টানেলের বিভীষিকা গোটা শরীরটা ঢুকিয়ে বসেছিল তার মধ্যে। গোটা শরীরের কল্পনাতীত চাপে রাস্তা ফেটে গেল মাঝখান থেকে। পাথর আর কংক্রিটের চাঁই ঠিকরে ঠিকরে গেল শূন্যে।

টাল সামলাতে পারেননি উতঙ্ক চৌধুরী। গড়িয়ে গেছিলেন ভাঙা রাস্তার ভেতরে স্বরূপহীনের জেলির ওপরে। বিলীন হলেন নিমেষে।

ওদিকে বিশু বোস আর মাধবীও দৌড়ে গিয়ে তফাতে থেকে পিচকিরি চালিয়ে যাচ্ছেন ভাঙা রাস্তার নিচে ফাঁক-ফোকর দেখলেই।

উতঙ্ক চৌধুরীকে যেখানে গ্রাস করা হয়েছে সেখানে গভীর পাতালকূপ লক্ষ করেছেন সুরেশ সাইকিয়া। অতিকায় জেলিদেহ জখম অংশকে পরিত্যাগ করে দ্রুত নেমে যাচ্ছে সেই কূপের মধ্যে। নিশ্চয় কন্দরের গোপন গুহানিবাসে সংরক্ষিত রয়েছে তার ব্রেন। স্প্রেগান কাঁধ থেকে নিমেষে খুলে ফেললেন সুরেশ সাইকিয়া। তিনটে টিনের দুটো দু'হাতে তুলে নিয়ে লাফিয়ে নেমে গেলেন ভাঙা রাস্তার গহ্বরে। জেলিদেহ যেখানে দ্রুত সেঁধিয়ে যাচ্ছে সেইখানে একটা টিনের প্যাঁচানো ছিপি খুলে উপুর করে ধরলেন। হলুদ তরল হুড় হুড় করে গড়িয়ে গেল ভেতরে। শূন্য টিন ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যখন দ্বিতীয় টিনের ছিপি খুলছেন তখন কেঁপে উঠল পায়ের তলার চাঙড়। গোটা রাস্তা আর আশেপাশের বাড়ি দুলছে। ঠিক যেন ভূমিকম্প হচ্ছে। পাতালের আদিম আতঙ্ক নিশ্চয় মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে শেষ আঘাত হানতে যাচ্ছে।

তিলমাত্র দেরি করলেন না তিনি। লাফ দিয়ে নেমে গেলেন আরও নিচে—কূপের ভেতরে। দ্বিতীয় টিনের হলুদ তরল পুরো ঢেলে দিলেন ভেতরে।

গুম গুম গুড় গুড় আওয়াজে আর কান পাতা যাচ্ছে না। ওপর থেকে বড় আর ছোট পাথর খসে নামছে কূপের ভেতরে। একটা পড়ল কাঁধে। হাড় বোধহয় ভেঙে

গেল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করলেন না সুরেশ সাইকিয়া। হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠতে লাগলেন ওপরে।

পাতালগহ্বর থেকে ভেসে এল সুগম্ভীর নিনাদ। একই সঙ্গে কাতরাচ্ছে অসংখ্য কণ্ঠস্বর মানুষ এবং পশুর। লক্ষ কোটি বছর ধরে যারা আহার্য হয়েছিল পাতালের আদিম আতঙ্কর, যাদের ক্ষুদ্র থেকে উন্নত ব্রেন জড়ো করে মহাবিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্বরূপহীন অজানা বিভীষিকা, তারাও এখন মৃত্যুযন্ত্রণার সম্মিলিত আর্তরবে পাতাল বিদীর্ণ করে চলেছে।

রাস্তার ওপরে উঠে এলেন সুরেশ সাইকিয়া। উন্মাদের মতন দৃষ্টিচালনা করলেন সামনে-পেছনে-ডাইনে বাঁয়ে। ওই তো দূরে হেঁট হয়ে স্প্রেগান চালিয়ে যাচ্ছেন বিশু বোস আর মাধবী। পরি আঁকড়ে রয়েছে দিদিকে। তিনজনেই দাঁড়িয়ে একই জায়গায়। দুটো স্প্রেগানের লক্ষ্যই একই দিকে—রাস্তার ভেতরে।

ব্রেনের কিছু অংশ কি ওখানেও প্রসারিত হয়ে রয়েছে?

বাকি টিনটা এক হাতে তুলে নিয়ে দৌড়লেন সুরেশ সাইকিয়া। অন্য হাত তো নাড়তে পারছেন না। হাড় নিশ্চয় ভেঙেছে। মাধবী আর বিশু বোসের চাহনি নিবদ্ধ নিচের দিকে। দেখতেও পেলেন না সুরেশ সাইকিয়া এসে হাঁপাচ্ছেন পাশেই। চোখ নামিয়েই দেখলেন সুরেশ সাইকিয়া স্বরূপহীনের শরীর। ব্রেন কি না বোঝা যাচ্ছে না তবে একটা প্রায়-জমাট লাভাপিণ্ড যেন ঠেলে উঠে আসতে চাইছে। পিচকিরি দিয়ে তাকে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করছেন মাধবী আর বিশু কেস। বিকৃত স্বরে পরিকে বললেন সুরেশ সাইকিয়া, ‘টিনের ছিপি... খুলে দে।’

পরি সাঙ্গ করল সেই কাজ। এক হাতে ভারী টিন উপুড় করার ক্ষমতা নেই সুরেশ সাইকিয়ার। পরি তা দেখল এবং বুঝল। দু’হাতে টিনের পেছন দিক ধরে উপুড় করে দিল লাভাকুণ্ডর মতন স্বরূপহীনের শরীরের ওপর।

গোটা রাস্তা এবার চৌচির হয়ে গেল। প্রবল আক্ষেপে মহাকায় অবয়ব দিয়ে শিবালয় সড়ককে ভেতরের দিকে বিদীর্ণ করে দিল ‘আদিম আতঙ্ক’। তার কিছুক্ষণ পরেই গুড় গুড় গুম গুম শব্দ মিলিয়ে গেল। নৈঃশব্দ্য নেমে এল শিবালয় টাউনে।

পড়ে রইল শুধু ভাঙা, আধভাঙা আর হেলেপড়া বাড়ির পর বাড়ি।

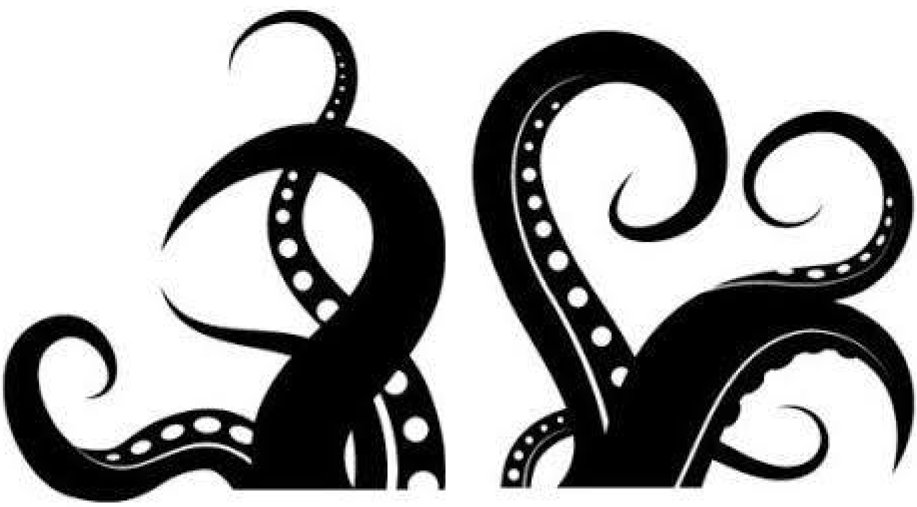
বহুদূর থেকেও আর্মি হেলিকপ্টারে জওয়ানরা দেখেছিল প্রলয়কাণ্ডের ফলে উত্থিত ধুলো আর ঠিকরে যাওয়া পাথর। সব যখন চুপ, যখন ভাঙা রাস্তার ওপর ভাঙা কাঁধ নিয়ে বসে পড়েছেন সুরেশ সাইকিয়া, যখন চারটে রুমালে গিঁট দিয়ে ফেট্টি বানিয়ে জায়গাটায় আরাম দেওয়ার জন্যে সুরেশ সাইকিয়ার হাত গলায় বেঁধে ঝুলিয়ে দিচ্ছে মাধবী, তখন হেলিকপ্টার সগর্জনে উড়ে এল মাথার ওপর।

ডক্টর চঞ্চল চক্রবর্তীর অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটা তাহলে কী?

বিরাট কিছু নয়। বিশেষ ধরনের অণুজীব—যার কাজ শুধু ব্যাধি সৃষ্টি করে যাওয়া। অত্যুন্নত গলনমিশ্র পন্থায় কোষে কোষে জোড়া লাগিয়ে আশ্চর্য এই ব্যাকটিরিয়া বানিয়েছিলেন ডক্টর চক্রবর্তী। দেখা গেল, এই অণুজীব আহার করে শুধু যৌগ হাইড্রোকার্বন—অশোধিত পেট্রলে যা থাকে। জাহাজ থেকে তেল বেরিয়ে সমুদ্রে ভেসে গেলে এই অণুজীব দিয়ে তেল পরিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া এই অণুজীবের আর কোনও কাজ ছিল না।

মোবাইল ল্যাবরেটরির কাচের ডিশে সামান্য লেগে ছিল এই অণুজীব। জানতেন শুধু অপরাজিতা সোম। তাই কাউকে না জানিয়ে আনিয়েছিলেন সেই অণুজীব হাইড্রোকার্বন দিয়ে গড়া 'আদিম আতঙ্ক'র শরীর নাশ করার মতলবে। তার টিসু জীবন্ত, রকমারি হাইড্রোকার্বনে বোঝাই, যেন পেট্রলেটাম-এর ভায়রা ভাই।

অণুজীব পরমানন্দে আহার করেছে তাকে। হয়তো তার ব্রেনকেও। কেননা, শিবালয় টাউনে আর তার উৎপাত ঘটেনি।



কল্পবিশ্ব পাবলিকেশনস

কল্পবিশ্ব উপন্যাসপর্ব ১: ছয়টি কল্পবিজ্ঞান, ফ্যান্টাসি ও হরর নভেলা
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ, সুপ্রিয় দাস ও সন্তু বাগ

ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ২০০: বিশ্বের প্রথম আধুনিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসকে নিয়ে গল্প, প্রবন্ধ এমনকী মেরি শেলির কাল্পনিক এক সাক্ষাৎকারের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও সন্দীপন গঙ্গোপাধ্যায়

কালসন্দর্ভা: অলৌকিক তন্ত্রচর্চার উপর লিখিত এক জটিল কিন্তু আনপুটডাউনেবল থ্রিলার।
লেখক: অঙ্কিতা

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ১ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সিদ্ধার্থ ঘোষ রচনা সংগ্রহ ২ (কল্পবিজ্ঞান): সিদ্ধার্থ ঘোষের কল্পবিজ্ঞান গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ, দীপ ঘোষ ও দেবজ্যোতি গুহ

সেরা আশ্চর্য! সেরা ফ্যানটাসটিক ১: আশ্চর্য! ও ফ্যানট্যাসটিক পত্রিকার নির্বাচিত সেরা গল্প ও উপন্যাসের সংকলন
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন

কেস অফ চার্লস ডেক্সটার ওয়ার্ড: হরর সম্রাট এইচ পি লাভক্র্যাফটের একমাত্র উপন্যাসের বঙ্গানুবাদ।
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

অর্থতৃষ্ণা: বাংলার প্রথম স্টিমপাঙ্ক থ্রিলার
লেখক: সুমিত বর্ধন

নক্ষত্রপথিক: দুটি কল্পবিজ্ঞান উপন্যাসের সংকলন।
লেখক: সুমিত বর্ধন

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৬: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৭: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: রণেন ঘোষ

সেরা কল্পবিশ্ব ২০১৮: নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞান, হরর ও ফ্যান্টাসি গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন
সম্পাদনা: দীপ ঘোষ ও সন্তু বাগ

এইচ জি ওয়েলস কল্পগল্প সমগ্র: কল্পবিজ্ঞান গল্প-উপন্যাসের সংকলন
অনুবাদ: অদ্রীশ বর্ধন

সবুজ মানুষ: সবুজ মানুষদের নিয়ে নির্বাচিত কল্পবিজ্ঞানের গল্প ও প্রবন্ধের সংকলন।
সম্পাদনা: অদ্রীশ বর্ধন, সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আদিম আতঙ্ক: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার উপন্যাস
লেখক: অদ্রীশ বর্ধন

রেবন্ত গোস্বামী কল্পবিজ্ঞান সমগ্র: রেবন্ত গোস্বামীর সমস্ত কল্পবিজ্ঞানের গল্প, কবিতা ও সাক্ষাৎকার।
সম্পাদনা: সুদীপ দেব

আদম ও ইভ: কল্পবিজ্ঞানের গল্প সংকলন
লেখক: অমিতাভ রক্ষিত

মনন শীল: তিনটি ইয়ং অ্যাডাল্ট বায়ো থ্রিলার
লেখক: পার্থ দে

ডেকাগন: কল্পবিজ্ঞান থ্রিলার সংকলন
লেখক: ঋজু গাঙ্গুলী

ভয়াল রসের সম্রাট-এইচ পি লাভক্রাফট: শ্রেষ্ঠ বারোটি রচনা, সটীক সংস্করণ।
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

স্বমহিমায় শঙ্কু: দুটি অসমাপ্ত শঙ্কু-কাহিনির সম্পূর্ণ রূপ
লেখক: সত্যজিৎ রায় ও সুদীপ দেব

রণেন ঘোষ রচনা সমগ্র ১: রণেন ঘোষের কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস ও গল্পের সংকলন
সম্পাদনা: সন্তু বাগ ও দীপ ঘোষ

আগামীর সাত মুখ: স্প্যানিশ কল্পবিজ্ঞান লেখক কার্লোস সুচলওস্কি কনের সাতটি কল্পবিজ্ঞান গল্পের সংকলন
অনুবাদ: সৌরভ ঘোষ ও রমা সরকার দাস, সম্পাদনা: অঙ্কিতা

মন্তাজ ইমপ্রিন্টের বই

হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন সমগ্র ১: বিখ্যাত হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন জুটিকে নিয়ে তিনটি উপন্যাস ও পঞ্চাশটি গল্প, নাটক, কবিতা
লেখক: শিবরাম চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী চিত্রিত, সম্পাদনা: সুদীপ দেব

প্রাপ্তিস্থান: অ্যামাজন, অরণ্যমন প্রকাশনী, দে বুক স্টোর (দীপু), বইচই, রিডবেঙ্গলীবুকস, বুকিকার্ট, বইঘর, দ্য বুকটক ইত্যাদি বুকস্টোরে।